চিরঞ্জীব মুজিব

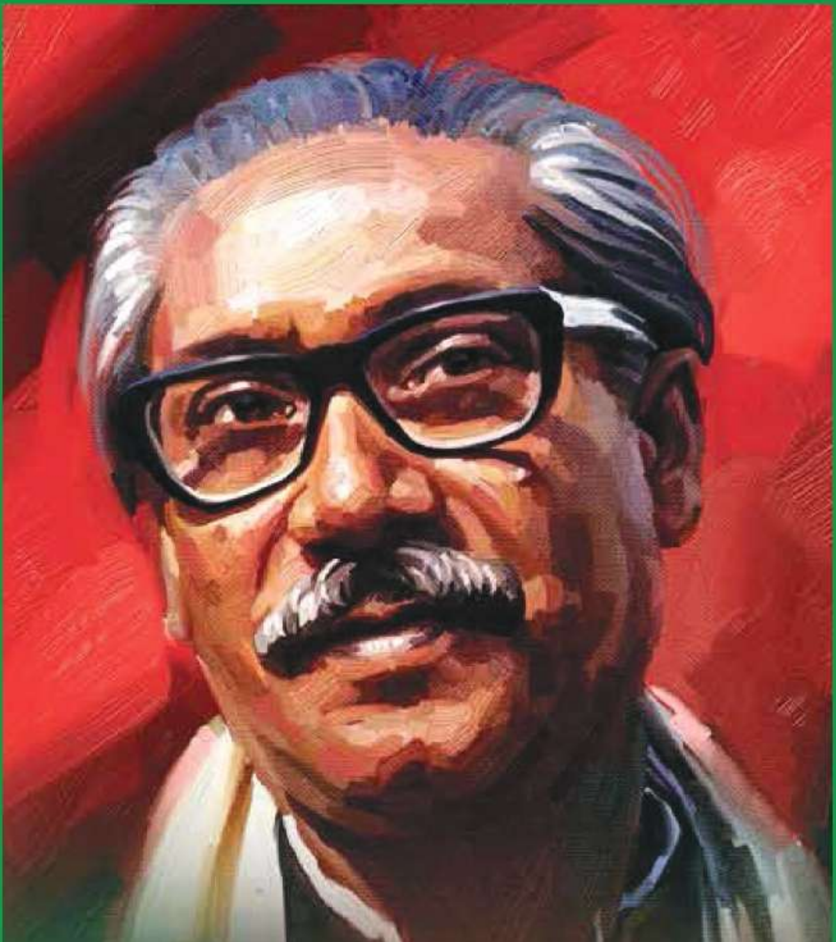

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

স্মরণিকা

চিরঞ্জীব মুজিব

মুজিব শতবর্ষ উদযাপন

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

চিরঞ্জীব মুজিব
মুজিব শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা

উপদেষ্টা

রাম চন্দ্র দাস
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন

সম্পাদনা পরিষদ

এ. এইচ.এম. গোলাম কিবরিয়া
যুগ্মসচিব
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের
পরিচালক (যুগ্মসচিব)
বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

ড. মল্লিক আনোয়ার হোসেন
যুগ্মসচিব
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

অনুপ কুমার তালুকদার
উপসচিব
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

মোঃ জাহিদ হোসেন
সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব (উপসচিব)
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

সৈয়দ শরিফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

আরিফুজ্জামান
সিনিয়র সহকারী সচিব
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

তানভীর আহম্মদ
জনসংযোগ কর্মকর্তা
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

প্রকাশনায়:
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল:
ডিসেম্বর ২০২০

মোঃ মাহবুব আলী
প্রতিমন্ত্রী
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী "মুজিববর্ষ" উপলক্ষে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এই মহতি উদ্যোগকে আমি আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। এর সাথে জড়িত সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ অভিন্ন সত্ত্বা। বাংলাদেশকে জানতে হলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জানতে হবে। তাঁর আদর্শকে জেনে অন্তরে ধারণ করতে হবে, সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে। আমাদের মহান নেতা আজীবন বাংলাদেশ ও এ দেশের মানুষের মঙ্গল ও মুক্তি কামনায় কাজ করেছেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ "সোনার বাংলা" হিসেবে গড়ে তোলা। জাতির পিতার আরাধ্য কাজ আজ বাস্তবায়িত হচ্ছে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে। আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে। সারা বিশ্বে বাংলাদেশ আজ এক উন্নয়ন বিস্ময়ের নাম।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের "সোনার বাংলা" বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে সমুন্নত রেখে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ও এর অধীন ৬ টি সংস্থার সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী আন্তরিকভাবে কাজ করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ মাহবুব আলী, এমপি

মোঃ মহিবুল হক
সিনিয়র সচিব
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে স্যুভেনির প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। স্যুভেনির প্রকাশের এ মূহুর্তে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি জাতির পিতার সহধর্মিনী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবসহ ৭৫ এর আগস্টের কালরাতে শহীদ হওয়া অন্যান্য স্বজনদের। আরও স্মরণ করছি ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ হারানো অগণিত মুক্তি সেনাদের।

স্বাধীনতার পরপরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন খাতকে বিশ্বমানে উন্নীত করার লক্ষ্যে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এ মন্ত্রণালয় দেশের বেসামরিক বিমান পরিবহনের উন্নয়ন এবং পর্যটনের বিকাশে বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে বিমান, পর্যটন এবং এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্জিত হয়েছে অভূতপূর্ব উন্নয়ন। আশা করছি অচিরেই দেশের বিমান ও পর্যটন খাত আর্ন্তজাতিক মানে উন্নীত হবে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অধিকতর অবদান রাখতে সমর্থ হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত স্যুভেনিরে মন্ত্রণালয় ও এর অধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচির সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। একই সাথে সন্নিবেশিত হয়েছে এ মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহের নিজস্ব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। এছাড়াও রয়েছে বিশিষ্ট লেখক, কলামিস্ট ও ব্যক্তিবর্গের মূল্যবান অভিব্যক্তি। আমি আশা করছি স্যুভেনিরটি বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ও এর আওতাভুক্ত সংস্থাসমূহের সামগ্রিক কার্যক্রম এবং মন্ত্রণালয়ের উৎপত্তি, বিকাশ ও উন্নয়নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর অসামান্য অবদান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে সমর্থ হবে।

পরিশেষে, স্যুভেনির প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মোঃ মহিবুল হক

সূচিপত্র

ক্রঃ নংঃ	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা নম্বর
১	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ঃ স্বপ্নদ্রষ্টা ও স্থপতি	এইচ টি ইমাম	০০
২	বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন ও পর্যটন	মোঃ মাহবুব আলী	০০
৩	আমার বঙ্গবন্ধু ও মুজিববর্ষ	ড. মুহাম্মদ সামাদ	০০
৪	মহা মানবের হাতের স্পর্শ	সৈয়দ আফরোজা বেগম	০০
৫	বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন আকর্ষণ ধানমন্ডি-৩২, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর	আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের	০০
৬	পর্যটন শিল্প বিকাশে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন	ড. মল্লিক আনোয়ার হোসেন শামীমা নাসরীন	০০
৭	মুজিববর্ষ, বাংলাদেশের ট্যুরিজম এবং ‘স্টার্ট উইথ নো বিগিনিং’	আবু সুফিয়ান	০০
৮	নদীর নাব্যতার নিঃশ্বাসে বাংলাদেশ	মাহবুব পারভেজ	০০

বঙ্গবন্ধু স্মৃতি অ্যালবাম

৯	উন্নয়নের অগ্রযাত্রার বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ মফিদুর রহমান	০০
১০	মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বেবিচক-এর গৃহীত কার্যক্রমসমূহ		
১১	বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও বাংলাদেশের পর্যটন ঃ স্বপ্নযাত্রা থেকে আজকের বাস্তবতা	রাম চন্দ্র দাস	০০
১২	মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক) এর গৃহীত কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন	মোঃ জিয়াউল হক হাওলাদার	০০
১৩	সোনার বাংলার স্বপ্নডানা ঃ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড	জিয়াউদ্দীন আহমেদ	০০
১৪	মুজিব শতবর্ষ ও বিমান		০০
১৫	বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড	জাবেদ আহমেদ	০০
১৬	বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এর মুজিববর্ষ পালন	শাহ্ আবদুল আলীম খান	০০
১৭	১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা হোটেল-এর ভূমিকা		০০
১৮	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম		০০
১৯	মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ		০০

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু : স্বপ্নদ্রষ্টা ও স্থপতি

এইচ টি ইমাম

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকীতে জানাই তাঁর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। এই মহামানবের স্মৃতি চীর অম্লান। তিনি এমনভাবে আমাদের জীবনে-কর্মে- হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন, যেন মনে হয় আমাদের মাঝেই আছেন। যুগ যুগ ধরে প্রজন্মের পর প্রজন্ম তাঁকে শ্রদ্ধায় আর ভালবাসায় স্মরণ করবে; তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা থেকে পাঠ নিবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন- সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা। এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পেছনে যে অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবোধ এবং পৃথক জাতিসত্ত্বা রয়েছে; জনগণ ও দলীয় সহকর্মীদের সাথে নিয়ে তিনি তা দীর্ঘদিনের লড়াই-সংগ্রাম, জেল-জুলুম, মেধা-পরিশ্রম দিয়ে তিল তিল করে বিকশিত করেছিলেন। তিনি এই রাষ্ট্রের স্থপতিও। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে নতুনভাবে রাষ্ট্র গড়ে তুলতে এমন কোন প্রতিষ্ঠান, আইন নেই যা তিনি সৃষ্টি করে যাননি। ইতিহাসে প্রথম বহু আকাঙ্ক্ষিত জাতীয় চার নীতির ওপর ভিত্তি করে তিনি সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধুমাত্র স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টাই ছিলেন না; একটি পুরোনো, জরাজীর্ণ এবং গণবিরোধী রাষ্ট্র থেকে একটি জাতিকে উদ্ধার করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন সেই জাতিকে উৎসাহিত এবং উজ্জীবিত করা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে অনুধাবন করেছিলেন ঐ রাষ্ট্রে বাঙ্গালী জাতির কোন স্থান হবে না এবং পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ববাংলাকে শুধুমাত্র শোষণ করবে, কোন উন্নয়ন করবে না। সেই ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের গোড়া থেকে তিনি আন্দোলন সংগ্রামের পথ ধরে গোটা বাংলাদেশ চষে বেড়িয়েছেন আর মানুষকে বুঝিয়েছেন যে তারা পাকিস্তানি নন, তারা বাঙালি। এই বাঙ্গালী জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি এবং জনমনে জাতিসত্ত্বা প্রোথিত করা একমাত্র বঙ্গবন্ধুর মতো অসীম সাহসী, দেশপ্রেমিক নেতার পক্ষেই সম্ভব ছিল। বাঙ্গালীর সুদীর্ঘ ইতিহাস বিদেশিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের ইতিহাস। বাঙ্গালী বীরের জাতি, কখনও মাথা নত করে নাই। এদেশের কৃষ্টি এবং ভাষা হাজার বছরের; এই বোধ থেকেই জন্ম হয় বাঙালি হিসেবে আমাদের গর্বের। এজন্যই বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা।

প্রথম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠা:

২৫ মার্চ কালরাত্রিতে যখন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঝাপিয়ে পড়ে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে, তখন বঙ্গবন্ধুর অনুসারি নেতৃবৃন্দ ও আপামর জনগণ যার যার অবস্থান থেকে তৎপর হয়ে ওঠেন। বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন এবং সেই বার্তা তৎকালীন ইপিআর-এর ওয়্যারলেস ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে চট্টগ্রামসহ দেশের সকল প্রান্তে তাৎক্ষণিক ছড়িয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধুর পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী তৎকালীন প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ সীমান্তবর্তী ভারতের বিশেষ একটি স্থানে সমবেত হয়ে গণপরিষদ গঠন করেন। এ গণপরিষদ বঙ্গবন্ধুর ২৬ মার্চের ঘোষণাকে কার্যকর করার জন্য এবং পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি এবং জাতির পিতা ঘোষণা করে ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ স্বাধীন সার্বভৌম, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টি করেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে এবং ঘোষণায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। ১০ এপ্রিল থেকেই সরকার কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ বর্তমান মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে (সাবেক বৈদ্যনাথ তলা) দেশি-বিদেশি কয়েকশত সাংবাদিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার উপস্থিতিতে এই সরকারের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়। স্থানটির নামকরণ হয় মুজিবনগর। প্রথম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা, বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করে।

লেখক: এইচ টি ইমাম, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

নবজাত বাংলাদেশে সংবিধান প্রণয়নঃ

মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে সংবিধান প্রণয়ন ছিল যুগান্তকারী ঘটনা। জাতীয় পুনর্গঠনের দিক বিবেচনায় দ্রুত সংবিধান প্রণয়নের প্রয়োজন ছিল। জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে স্বাধীনতার ১১ মাসের মধ্যে গণপরিষদ সংবিধান প্রণয়ন করে এবং ৪ নভেম্বর '৭২ তা গৃহীত হয়। স্বাধীনতার প্রথম বর্ষপূর্তির দিন ১৬ ডিসেম্বর '৭২ থেকে তা কার্যকর হয়। প্রসঙ্গত বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে স্বদেশের মাটিতে পা দিয়েই ঘোষণা করেন যে, ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অপশাসনমুক্ত শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যই সংবিধানে জাতীয় চার নীতি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা হিসেবে ঘোষিত হয়। অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদ, শোষণমুক্ত সমাজ, সংসদীয় গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও মানবাধিকার হয় সংবিধানের ভিত্তি। মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে প্রণীত এই সংবিধান বিশ্ব ইতিহাসে অনন্য। এই সংবিধানের ভিত্তিতে ৭ মার্চ '৭৩ প্রথম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এত স্বল্প সময়ের মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন ও নির্বাচন অনুষ্ঠান ছিল ইতিহাসে বিস্ময়কর ও বিরল ঘটনা।

সার্বভৌম রাষ্ট্র পরিচালনাঃ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধুমাত্র একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টাই ছিলেন না; তিনি একটি আধুনিক রাষ্ট্রের সত্যিকার স্থপতি ছিলেন। একদিকে রাষ্ট্র পরিচালনা অন্যদিকে একটি গণমুখী প্রশাসন স্থাপনও করে গিয়েছিলেন অতি অল্প সময়ের মধ্যে। একই সাথে সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রে পৃথকভাবে নির্বাহী (সরকার), সার্বভৌম সংসদ, স্বাধীন বিচার বিভাগ এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে নির্বাচন পরিচালনার জন্য RPO, 1972 জারি এবং নির্বাচন কমিশন গঠন করেন। রাষ্ট্রের পরিচালনার কার্যপদ্ধতি (Rules of Business) ও কার্যবন্টন (Allocation of Business) প্রণয়নও করেন।

বঙ্গবন্ধুর আরেকটি বিশেষ কৃতিত্ব ছিল আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য তিনি সশস্ত্রবাহিনী শক্তিশালীকরণে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। সেই সাথে পুলিশ এবং অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আধুনিকায়ন করেছিলেন।

স্বাধীন ও সার্বভৌমত্বের পরিচিতিঃ

একটি আধুনিক রাষ্ট্রে বহির্বিশ্বের সরকারের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে আরো অনেকগুলো অত্যন্ত জরুরি বিষয় প্রতিষ্ঠা করতে হয়। যেমন জাতীয় সংগীত এবং সেই সাথে তার বিধি, জাতীয় পতাকা আইন ইত্যাদি। ১৩ জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদ সভায় গৃহীত হয় জাতীয় সংগীত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পতাকা আইন, ১৯৭২ ও জাতীয় প্রতীক আইন, ১৯৭২ অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় পতাকা ও জাতীয় প্রতীক।

কিলো ফ্লাইটঃ

১৯৭১ এর ২রা মে ঢাকা চট্টগ্রাম সড়কে ফেনী নদীর উপরে শুভপুর ব্রীজে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন সেটি ভেঙ্গে পড়ে। তার পরপরই পাকিস্তান বিমান বাহিনী প্রথমে শুভপুর এবং পরে আমাদের অস্থায়ী ক্যাম্প রামগড়ের উপরে হামলা চালায়, একই সাথে বোমাবর্ষণ এবং মেশিনগান থেকে গুলি। এরকম পরিস্থিতি হতে পারে চিন্তা করে আমরা পূর্ব থেকেই রামগড়ের উল্টো দিকে ভারতের সাবরুমে কার্যালয়ের স্থানান্তরের ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম। মার্চ-এপ্রিল মাসে ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং সিলেট বিভাগ থেকে বিপুল সংখ্যক শরণার্থী ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণ করে। এই সময় আমাদের কয়েকজন সহকর্মী এবং রাজনৈতিক নেতা ত্রিপুরার আগড়তলায় আঞ্চলিক দপ্তর গড়ে তোলেন। জায়গাটির নাম ছিল কর্ণেল চৌমুহনী। এখানে প্রয়াত জহুর আহমেদ চৌধুরী, এম এ হান্নান, প্রফেঃ খালেদ এবং আরও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ অবস্থান করছিলেন। মে ১৯৭১ সালে আমি সপরিবারে আগরতলায় উপস্থিত হই এবং তার কয়েকদিন পর থেকেই আঞ্চলিক প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করি। ঐ সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আগরতলায় আশ্রয় নেন, তাদের অধিকাংশের গন্তব্য ছিল কলকাতায়। আগরতলার সাথে কলকাতার যোগাযোগ ছিল আকাশ পথে ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্স এর মাধ্যমে; স্থল পথেও যাওয়া যেত কিন্তু সেটি ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং সময় সাপেক্ষ। ত্রিপুরার মোট জনসংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষের মত এবং বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থী ছিল প্রায় পঁচিশ লক্ষ। স্বভাবতই সমস্যারও অন্ত ছিল না। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এবং ত্রিপুরার রাজ্য সরকারের সমর্থন থাকা সত্বেও আমাদের আঞ্চলিক দপ্তরের উপর প্রচণ্ড চাপ ছিল। কর্ণেল চৌমুহনীর অফিসে নানারকম অভিযোগ নিয়ে বিপুল সংখ্যক বাঙালি নাগরিক উপস্থিত হতেন। এরকম

সময়ে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলের আগমন ঘটে। কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে কলাকৌশলীরা এসে দাবী করেন তাদের জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সমিটার ব্যবস্থা করার জন্য। সেটি সম্ভব ছিল একমাত্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর আনুকূল্যে, সে ব্যবস্থা আমরা করেছিলাম এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র অংকুরিত হয় ত্রিপুরাতেই।

অপর গুরুত্বপূর্ণ যে দলটি আমাদের দপ্তরে এসে উপস্থিত হন তারা সবাই ছিলেন উচ্চপদস্থ বিমান বাহিনীর সদস্য এবং তাদের সাথে পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স (PIA) এর বৈমানিকগণ। তারা এসেছিলেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য। এই দলটির নেতৃত্বে ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে. খন্দকার। তাঁর সাথে উইং কমান্ডার বাশার, SQ. LDR সদরউদ্দিন, SQ. LDR ফজলুর রহমান, SQ. LDR সুলতান, ক্যাপ্টেন আকরাম আহমেদ PIA এর জ্যেষ্ঠ ক্যাপ্টেন সাহাবুদ্দিন এবং আলমগীর সাত্তার এদের সবাইকে বিশেষ ব্যবস্থায় ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স মারফত কোলকাতায় পাঠিয়ে দিলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনকে অবহিত করলাম। এই অসীম সাহসীরা পরবর্তীকালে উত্তরপূর্ব ভারতে প্রথম বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর কিলো ফ্লাইট প্রতিষ্ঠা করেন। ৭১ এর ডিসেম্বরে এই কিলো ফ্লাইটের বৈমানিকরাই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানি ঘাটির উপর আক্রমণ চালায়। এদের মধ্যে বেসামরিক ক্যাপঃ আলমগীর সাত্তার বীর বিক্রম এবং ক্যাপঃ শাহাবুদ্দিন বীর উত্তম পদকে ভূষিত হয়, মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের যাত্রা:

৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে প্রাক্তন PIA এর ক্যাপ্টেনগণ বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করেন ধানমন্ডির ১৮ নম্বর রোডের তাঁর অস্থায়ী বাসভবনে। এই বাড়িটিতেই বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানিদের দ্বারা গৃহবন্দি হয়েছিলেন। এখান থেকেই ক্যাপঃ কামাল এবং লেঃ জামাল কৌশলে বের হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এখানেই আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনা ছিলেন তার মায়ের সাথে, তাঁর কোলে জয়। উল্লেখ্য, ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িটি বসবাসযোগ্য করতে কিছুদিন সময় লেগেছিল।

বঙ্গবন্ধু মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন অন্যান্য স্বাধীন দেশের মত বাংলাদেশেরও পতাকাবাহী একটি এয়ারলাইন্স থাকুক। পাইলটগণ বঙ্গবন্ধুর কাছে আবেদন করলেন তাদের একটি বিমান সংগ্রহ করে দিতে যাতে তারা নবগঠিত বিমান বাংলাদেশকে চালু করতে পারেন। ঐ সময় মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত বিমানবাহিনীর একটি ডিসি-৩ (ডাকোটা) বিমান ছিল। তারা অনুরোধ করলেন বঙ্গবন্ধুকে, তিনি যেন কর্ণেল ওসমানি সাহেবকে বলে ঐ এয়ারক্রাফটি বিমানকে দিয়ে দেন। বঙ্গবন্ধু তাৎক্ষণিকভাবে ওসমানি সাহেবকে নির্দেশ দিলে তিনি গ্রুপ ক্যাপঃ খন্দকারের সাথে আলোচনা করে বিমানের বহরে হস্তান্তর করলেন।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের প্রথম ফ্লাইট ছিল ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা। ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই একটি ফ্লাইট চালু ছিল। ঐ সময় কয়েকজন নতুন বৈমানিককে নিয়োগ দেওয়া হয় এবং তাদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নেন PIA এর জ্যেষ্ঠ Boeing ক্যাপঃ এস এম হায়দার (সবুজ)। দুর্ভাগ্যবশত এমন একটি প্রশিক্ষণ ফ্লাইটে দুর্ঘটনায় ডিসি-৩ বিমানটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং তার সাথে মৃত্যুবরণ করেন ক্যাপঃ হায়দার। এপ্রিল-মে মাসের দিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী বিমানের ব্যবহারের জন্য দুইটি Fokker ফ্রেন্ডশীপ বিমান উপহার দেন। এই দুটি বিমান দিয়েই বিমানের অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটগুলো চালানো হতো। এরপর বিমান একটি Boeing-707 চার্টার্ড করে এবং ঐ একটি বিমান দিয়েই ঢাকা-লন্ডন ফ্লাইট চালু করে। তখন রুট ছিল ঢাকা-বাহরাইন-লন্ডন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র ১৯ দিনের মাথায় জন্ম নেয় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ নং ১২৬ অনুসারে ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স প্রতিষ্ঠিত হয়। বিমানের বিখ্যাত “বলাকা” লোগোটি ডিজাইন করেছিলেন শিল্পী কামরুল হাসান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চেয়েছিলেন ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত, শিক্ষিত এবং আধুনিক এমন একটি রাষ্ট্র যেটি পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান দেখলেই বোঝা যায় যে বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর সহকর্মীরা কী অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে এই দেশের

মানুষের সুখ, দুঃখ, চাওয়া-পাওয়ার অবলোপন করেছেন এবং এই জনগোষ্ঠীকে কীভাবে উন্নততর জীবন জীবিকা উপহার দেয়া যায়, তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। বাংলাদেশ বিরোধী এবং পাকিস্তানপন্থি বিরাট সংখ্যক একটি জনগোষ্ঠী এই স্বাধীন বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ঘাপটি মেরে ছিল। বাংলাদেশের সংবিধান এবং এর প্রণেতাদের প্রতি তাদের ছিল অবিমিশ্রিত ঘৃণা। তারা তাই শত্রুদের পক্ষ হয়ে তাদের পরামর্শে জাতির পিতাকে সপরিবারে এবং জাতীয় চার নেতাকে হিংস্র হায়েনার মতো নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে প্রায় দীর্ঘ ২১ বছর বাংলাদেশ উল্টো পথে চলেছে, যে বাংলাদেশ সৃষ্টির জন্য বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়েছিলেন এবং লক্ষ লক্ষ মা-বোনেরা সম্ভ্রম হারিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু ক্ষমতায় ছিলেন মাত্র- ১১ জানুয়ারি ১৯৭২ থেকে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ পর্যন্ত ৩ বছর ৭ মাস ৫ দিন। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে তিনি অসাধ্য সাধন করে গেছেন। রাষ্ট্র মানে শুধু একটি ম্যাপ বা একটি নির্দিষ্ট ভূমি নয়, শুধু জাতীয় পতাকা কিংবা জাতীয় সংগীত নয়। রাষ্ট্র হলো এর সকল নাগরিকের জন্য কল্যাণকর এমন একটি ব্যবস্থা সৃষ্টি করা যেখানে সকলের অধিকার নিশ্চিত করা যায়। আধুনিক রাষ্ট্র গড়ে তুলতে যার যে সমস্ত স্তম্ভ দরকার সেগুলিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করা এবং এমন সমস্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেগুলো একটি আরেকটির পরিপূরক।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জাতির পিতা এবং রাষ্ট্রের স্থপতি সুদূর প্রসারী চিন্তা ভাবনা নিয়ে একটি আধুনিক রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। ধ্বংসস্তুপ থেকে উঠে আসা বাংলাদেশ- জাতির পিতার নেতৃত্বে বিশ্ব মন্দার মধ্যেও ৯.৬% প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছিল। তারই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে আর এক উচ্চতায় নিয়ে এসেছেন। বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত স্বপ্ন " সোনার বাংলা" আজ বাস্তবায়নের পথে।

"জয় বাংলা ,জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক"

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন ও পর্যটন

মোঃ মাহবুব আলী, এমপি

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ একই সত্তার দুটি নাম। সকল অর্থে তিনিই বাংলাদেশ। জীবনভর তিনি এ দেশ ও মানুষের মুক্তি, উন্নতি ও সমৃদ্ধির কথা ভেবেছেন। গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করেছেন। বাঙালির দুঃখ, বেদনা, আনন্দ ও স্বপ্নকে তিনি নিজের মধ্যে ধারণ করেছেন। ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নাগপাশ হতে মুক্ত করে তিনি আমাদের শুধু একটি দেশই উপহার দেননি সদ্য স্বাধীন হওয়া একটি দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য যুগোপযোগী পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি রূপরেখা তৈরি করেছেন। যে কোন দেশপ্রেমিক বাঙালির চিরন্তন অনুপ্রেরণার উৎস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, মহান নেতা, বাংলাদেশের জন্মদাতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তির সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত মূল্যবোধ আমাদের উন্নয়নের মূলমন্ত্র।

মুক্তিযুদ্ধের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ পুনর্গঠনের দায়িত্ব নিয়ে বঙ্গবন্ধু একজন দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। দেশের উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে তা পুনর্গঠনের লক্ষ্যে মনোযোগ দেন তিনি। তিনি বিশ্বাস করতেন দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন পদ্ধতির মাধ্যমেই এদেশের সাফল্য নিশ্চিত হবে। দেশের কৃষি, শিল্পসহ অর্থনীতির নানান ক্ষেত্রে আবার নতুন করে যাত্রা শুরু করে তাঁর হাত ধরে। পর্যটনও তার ব্যতিক্রম নয়। বঙ্গবন্ধু জানতেন পর্যটন শিল্পের পরিকল্পিত বিকাশের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা যেমন সম্ভব তেমনি পর্যটনের মাধ্যমেই সারা বিশ্বে বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি, পুরাকীর্তি ও প্রত্নতত্ত্ব , ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় জীবনধারা, দিগন্ত বিস্তৃত হ্রদ, চা বাগান ও নদীর সৌন্দর্যসহ বাংলাদেশের প্রকৃতির অপরূপ রূপ সফলভাবে তুলে ধরার সুযোগ রয়েছে। জাতির পিতার হাত ধরেই বাংলাদেশে পর্যটনের বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু। ১৯৭২ সালে জাতির পিতা দেশের পর্যটন শিল্পের বিকাশের স্বার্থে প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন। পরবর্তীতে পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানসমূহ চিহ্নিত করে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন এবং দেশের অর্থনীতিতে পর্যটন শিল্পের ক্রমবর্ধমান অবদানকে আরও শক্তিশালী করার জন্য ২০১০ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড গঠন করেন। দেশের পর্যটনের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে প্রস্তুত হচ্ছে পর্যটন মহা-পরিকল্পনা। এই মহা পরিকল্পনার ফলে দেশের পর্যটন শিল্পের গুণগত মানের হবে উন্নয়ন। পর্যটনের বিকাশের সুবিধার্থে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডকে স্থায়ী ঠিকানা ‘পর্যটন ভবন’ নির্মাণ করে দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়ন ভাবনা ছিল যুগের থেকেও আধুনিক। ইতিহাসের ক্ষণজন্মা এই পুরুষ তার চিন্তা, ভাবনা ও কর্মে তার ছাপ রেখে গেছেন। পরিবেশ সুরক্ষার মাধ্যমে শিল্পের উন্নয়নের কথা যখন সারা পৃথিবী চিন্তাও করেনি তখনই তা নিয়ে ভেবেছেন বঙ্গবন্ধু। তিনি প্রথম দেখিয়েছেন উন্নয়ন ও প্রকৃতির সুরক্ষা পাশাপাশি পথ চলতে পারে। পরিবেশের সুরক্ষার মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের বিকাশ অর্থাৎ সাম্প্রতিক কালে যা “ইকো ট্যুরিজম” নামে পরিচিত তার প্রবর্তন বাংলাদেশে হয়েছে জাতির পিতার হাত ধরে। তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার সময়ে সেই ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের গর্ব পৃথিবীর দীর্ঘতম বালুকাময় সমুদ্রসৈকত কক্সবাজারে পরিবেশের সুরক্ষা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য তৈরি করেছেন ঝাউবন। সামাজিক বনায়ন ও উপকূলীয় বনাঞ্চল তৈরির সূচনাও হয়েছিল জাতির পিতার হাত ধরেই। তিনিই প্রথম অনুধাবন করেছিলেন সবুজ প্রকৃতি পর্যটনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ।

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন ছিল এদেশের গণমানুষের সুখ- সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক গভীর মানবিক সংগ্রামী দর্শন। তিনি তাঁর এক ভাষণে বলেছিলেন-“আমি কী চাই? আমি চাই বাংলার মানুষ পেট ভরে খাক। আমি কী চাই? আমার বাংলায় বেকার কাজ পাক। আমি কী চাই? আমার বাংলার মানুষ সুখী হোক। আমি কী চাই ? আমার বাংলার মানুষ হেসে খেলে বেড়াক। আমি কী চাই? আমার সোনার বাংলায় মানুষ আবার প্রাণভরে হাসুক ।” বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও বেকারত্ব দূরীকরণে পর্যটন গুরুত্বপূর্ণ

লেখক: মোঃ মাহবুব আলী, এমপি, প্রতিমন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমিকা রাখতে পারে। আমরা সবাই জানি সারা বিশ্বে পর্যটন সব চাইতে কর্মঘন শিল্পগুলোর একটি। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রতি ১০ টি কর্মসংস্থানের মধ্যে একটি কর্মসংস্থান তৈরি হয় পর্যটন খাতে। আমাদের দেশেও পর্যটন খাতে এখন পর্যন্ত মোট কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ২৪ লাখ ৩২ হাজার মানুষের। দেশে পর্যটনের বিকাশের মাধ্যমে সকল শ্রেণির মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি করে বেকারত্ব হ্রাস ও দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব। কোন নির্দিষ্ট এলাকায় পর্যটন শিল্পের বিকাশের ফলে সেই এলাকার অর্থনীতিতে যেমন গতি তৈরি হয় তেমনি তা জাতীয় সামষ্টিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অর্থনীতির গতি বৃদ্ধির ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় নানান শ্রেণি ও পেশার মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সুবিধাভোগী হওয়ায় সামষ্টিকভাবে পুরো এলাকার মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাবনায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল গ্রাম উন্নয়ন, কৃষির উন্নয়ন, মেহনতী মানুষের আয় ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন; সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস। গ্রামের সম্ভাবনার কথা বলতে গিয়ে তিনি তাঁর এক ভাষণে বলেছিলেন “বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন ধ্যান, ধারণা ও আরাধনার ধন। আর সে সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচে-কানাচে, চির উপেক্ষিত পল্লীর কন্দরে কন্দরে, বিস্তীর্ণ জলাভূমির আশেপাশে আর সুবিশাল অরণ্যের গভীরে”। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন গ্রামের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে গ্রামীণ মানুষের জীবনের উন্নয়ন। তিনি আজীবন প্রান্তিক মানুষের অধিকার ও উন্নয়নের জন্য কাজ করেছেন। গ্রামের সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে প্রত্যন্ত এলাকা পর্যন্ত পর্যটন উপাদান চিহ্নিত করে তা উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়ন ও গ্রামের প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নে পর্যটন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার “গ্রাম হবে শহর” কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামে শহরের নাগরিক সুবিধা পৌঁছে যাচ্ছে। এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ফলে বাংলাদেশের গ্রামীণ সামাজিক অবস্থা এখন পূর্বের যে কোন সময়ের থেকে উন্নত। দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের ফলে গ্রামীণ এলাকায় পর্যটনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে গ্রামীণ পর্যটনের বিকাশের মাধ্যমে পর্যটন কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট এলাকায় সৃষ্টি হচ্ছে একটি করে গ্রোথ সেন্টার যা সংশ্লিষ্ট এলাকার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে।

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের পর্যটনের উন্নয়নে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা এখন বাস্তবায়িত হচ্ছে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে। দেশে পর্যটনের বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন তিনি। পর্যটকদের যাতায়াতকে সহজ, দ্রুততর ও আরামদায়ক করতে ও তাদের আন্তর্জাতিক মানের সেবা প্রদান করতে আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ও নির্দেশে দেশের সকল বিমানবন্দরে উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- ২১ হাজার ৩ শত ৯৯ কোটি টাকা ব্যয়ে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের ৩য় টার্মিনাল। নান্দনিক সৌন্দর্যের ৩য় টার্মিনালে অবকাঠামোগত সকল সুবিধা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সকল দেশি-বিদেশি যাত্রী এই টার্মিনালের মাধ্যমে ভ্রমণকালে আধুনিক সব সুযোগ-সুবিধা পাবেন। এছাড়াও ৫ হাজার ৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের রানওয়ে শক্তিশালীকরণ ও এয়ার ফিল্ড গ্রাউন্ড লাইটিং সিস্টেম স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলছে, সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ২ হাজার ৭ শত ৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন টার্মিনাল ভবন নির্মাণ ও রানওয়ে শক্তিশালীকরণ প্রকল্প চলমান রয়েছে। কক্সবাজার ও সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে আঞ্চলিক এভিয়েশন হাব হিসেবে গড়ে তোলার কাজ চলমান রয়েছে। ৫ হাজার ১ শত ৭৯ কোটি টাকা ব্যয়ে কক্সবাজার বিমানবন্দরে নতুন টার্মিনাল ভবন নির্মাণ, রানওয়ের শক্তি বৃদ্ধি করার পাশাপাশি এর দৈর্ঘ্য ৯০০০ ফুট থেকে বাড়িয়ে ১২০০০ ফুট করা, নিরাপত্তা প্রাচীর নির্মাণ, এয়ার ফিল্ড গ্রাউন্ড লাইটিং সিস্টেম স্থাপন এর কাজ চলমান রয়েছে। এই বিমানবন্দরের উন্নয়ন কাজ সমাপ্তির পর আঞ্চলিক হাবে পরিণত হওয়ার কারণে কক্সবাজার প্রতিবেশী বিভিন্ন দেশের পর্যটকদের জন্য পর্যটন স্বর্গে পরিণত হবে। এছাড়াও দেশের ভিতরে পর্যটকদের জন্য সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় মেট্রো রেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে, কক্সবাজারের ঘুংদুম পর্যন্ত রেল লাইন ও মাননীয়-প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় নেতৃত্বে সম্পূর্ণ দেশীয় অর্থায়নে তৈরি হচ্ছে বিশ্বের গভীরতম ভিত্তির ৬.১৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের পদ্মা সেতু।

পর্যটনের প্রসারে সহায়তা ও বহির্বিশ্বে দেশের গৌররবময় পদচারণা নিশ্চিত করতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গড়ে তোলেন রাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী প্রতিষ্ঠান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া এই প্রতিষ্ঠান বিকশিত হচ্ছে তাঁর কন্যা

জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে। তিনি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের জন্য ক্রয় করেছেন বিশ্বের অত্যাধুনিক সব উড়োজাহাজ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ও আগ্রহে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বহরে ইতোমধ্যে যুক্ত হয়েছে সম্পূর্ণ নতুন ৪ টি বোয়িং ৭৭৭, ৪টি বোয়িং ৭৮৭-৮ সিরিজের ড্রিম লাইনার, ২টি বোয়িং ৭৮৭-৯ সিরিজের ড্রিম লাইনার ও একটি ড্যাশ-৮ উড়োজাহাজ। অচিরেই আরো ২ টি নতুন ড্যাশ-৮ উড়োজাহাজ বিমানের বহরে যুক্ত হবে। এই সব নতুন ও অত্যাধুনিক উড়োজাহাজ নিয়ে বিমানের বহর এখন পর্যটকদের আন্তর্জাতিক মানের সেবা দিতে পারবে।

আজ বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের মধ্যে যে প্রভূত উন্নয়ন লক্ষ্য করা যায়, তার স্বপ্নদ্রষ্টা বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনার ব্যাপ্তি ছিল সর্বত্র ও সার্বজনীন। জাতির পিতার কালজয়ী উন্নয়ন দর্শনের মূল ভিত্তি ছিল জনকল্যাণ । জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করে জাতির পিতার স্বপ্নের “সোনার বাংলা” গড়ে তুলতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পর্যটন সব সময়ই সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের সফলতা প্রশংসিত হয়েছে সারা বিশ্বে। বাংলাদেশ লাভ করেছে বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কার। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সফলতার ন্যায় জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও আমরা সফল হব। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কাজ করছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন ৬ টি সংস্থা। বাংলাদেশের গণমানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির যে স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন তা বাস্তবায়ন করতে পর্যটন হবে অন্যতম মাধ্যম। পর্যটন বেকারত্ব হ্রাস, মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, গ্রামীণ উন্নয়ন, পরিবেশ সুরক্ষা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বাংলার গৌরবময় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ উন্নয়ন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনকে প্রতিফলিত করবে।

আমার বঙ্গবন্ধু ও মুজিববর্ষ

ড. মুহাম্মদ সামাদ

তখন ষাটের দশকের মাঝামাঝি। সরিষাবাড়ী রানী দিনমনি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ার সময়- রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই আর জেলের তালা ভাঙবো/ শেখ মুজিবকে আনবো এই স্লোগানগুলো আমাদের কচিকণ্ঠে তুলে নিয়েছিলাম। ঊণসত্তরের উত্তাল দিনগুলোতে পূর্ববাংলার কৃষক-শ্রমিক-ছাত্রজনতার প্রিয় নেতা শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে সর্বস্তরের মানুষ স্লোগান তুলেছিল- আমার নেতা তোমার নেতা/ শেখ মুজিব শেখ মুজিব/ জেলের তালা ভাঙবো/ শেখ মুজিবকে আনবো। আমাদের স্কুলের বড় ভাইয়েরা বাঁশের কঞ্চি বা গাছের চিকন ডাল হাতে নিয়ে আমাদের ক্লাস থেকে তাড়িয়ে বের করে মিছিলে নিয়ে যেতো। মিছিল শিমলাবাজার ঘুরে আবার স্কুলে ফিরে এসে শেষ হতো। সেসময়ের কাঁচা রাস্তার ধুলোর সমুদ্রে মিছিল করে আমাদের বই-খাতা-পোশাক আর মাথার চুল সাদা হয়ে যেতো। বলা বাহুল্য, আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদেরও মনে মনে সমর্থন ছিল শেখ মুজিবের মুক্তির আন্দোলনে। ফলে, আর ক্লাস করতে হতো না বলে আমরা খুব খুশি মনে বাড়ি ফিরতাম। আগে-ভাগে বাড়ি ফিরে যাওয়ার আনন্দ আমাদের মিছিলে যাবার বাড়তি উৎসাহ যোগাতো। আমার পরম সৌভাগ্য যে, তৎকালীন পূর্ব বাংলার সর্বস্তরের মানুষের প্রিয়নেতা ‘শেখ সাহেবকে ১৯৭০ সালে আর ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৭৩ সালে দেখার সুযোগ হয়েছিল।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি পেয়ে সারাদেশ চষে বেড়াচ্ছেন বঙ্গবন্ধু। সত্তর সালের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি একদিন বিদ্যুৎগতিতে খবর ছড়িয়ে পড়লো আগামীকাল ফাইভ-আপ ট্রেনে শেখ সাহেব সরিষ বাড়ী আসছেন এবং জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে জনসভায় ভাষণ দেবেন। ফাইভ-আপ ট্রেনটি ময়মনসিংহ জংশনে ঢাকা-চট্টগ্রামের বগি সংযুক্ত করে লম্বা হয়ে অজগরের মতো হেলেদুলে ছুটে আসলো আমাদের স্টেশনে। রেলস্টেশনের উপর দিয়ে আমরা স্কুলে যেতাম। শীতের সকাল। আমি ক্লাস এইটের ছাত্র। বই-খাতা নিয়ে স্কুলে যাচ্ছিলাম। ট্রেন এসে থামল সরিষাবাড়ী স্টেশনে। রেলস্টেশনে গিজগিজ করছে মানুষ। কোথাও তিল ধারণের জায়গা নেই। “জেলের তালা ভেঙেছি/ শেখ মুজিবকে এনেছি”- স্লোগানে স্লোগানে স্টেশন চত্বর আর আশপাশ মুখরিত । প্রিয়নেতা শেখ সাহেব রেলগাড়ির দরোজায় দাঁড়িয়ে হাত তুলতেই মানুষের সে কী উল্লাস! “জেলের তালা ভেঙেছি/শেখ মুজিবকে এনেছি”.. উচ্ছ্বসিত জনতার হাজারো কণ্ঠে শেখ মুজিবের জয়ধ্বনি! না দেখলে সে দৃশ্য কল্পনা করাও অসাধ্য। তারপর ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে হ্যান্ডমাইকে বঙ্গবন্ধু সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিলেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে সদ্য কারামুক্ত রোগা-শ্যামলা-ক্লান্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সেই আমার প্রথম দেখা! সারা বাংলার মানুষ যাঁকে এক নামে চেনে; যাঁর মুক্তির জন্য আমরা মিছিল করেছি; স্লোগানে স্লোগানে কচিকণ্ঠে রাজপথ মুখরিত করেছি; সেই স্বপ্নের শেখ মুজিবকে আমাদের রেলস্টেশনে এভাবে দেখবো স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। এই তো বাঙালির প্রাণপ্রিয় নেতা শেখ সাহেব-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান! আবেগে আপ্লুত ও স্তম্ভিত হয়ে প্লাটফরমে ভিড়ের ভিতরে দাঁড়িয়েছিলাম । হঠাৎ ঢং-ঢং করে ট্রেন ছাড়ার ঘন্টা বাজলো। আমাদের চেনা-অচেনা সবাই হুড়মুড় করে জগন্নাথগঞ্জ মুখী ট্রেনে উঠে পড়ছিলো। আমিও সবার দেখাদেখি সেদিন বই-খাতা নিয়েই ট্রেনে উঠে পড়লাম। ট্রেনে তিল ধারণের জায়গা ছিলো না। রেললাইনের দুইপাশেও শত-সহস্র মানুষ হাত নেড়ে স্লোগান দিয়ে তাঁদের প্রিয় নেতাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিলো। ধীর গতির ট্রেনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে পৌঁছলাম।

জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে যমুনা নদীর তীরে অনেক উঁচু ও বড় মঞ্চ করা হয়েছিলো। এখানে মঞ্চে এসে বঙ্গবন্ধু দুহাত তুলে শুভেচ্ছা জানালেন জনতাকে। অসংখ্য ফুলের মালায় তাকে বরণ করে নেয়া হলো। গোলাপ আর গাঁদা ফুলের লাল-হলুদ পাঁপড়িতে ভরে গেলো তার শালপ্রাংশু ঋজু-দীর্ঘ-কান্তিমান দেহ। জগন্নাথগঞ্জ ঘাট লোকে লোকারণ্য। কে নেই এখানে? মাথায় গামছা বাঁধা কৃষক, মাঠের রাখাল, লালশার্ট পরা ঘাটের কুলি, বই-খাতা বুকে চেপে স্কুলের অবোধ বালক-বালিকা, নৌকার মাঝি, ছাত্র-যুবক, শিক্ষক-কর্মচারী, ঘোমটা মাথায় গৃহবধূ-মা-বোন সবাই এসেছে এখানে; সবাই হাজির। সকলের উত্তেজিত বাহুতে ও ঘর্মাক্ত মুখে ধ্বনিত-

---

লেখক: ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ও সভাপতি, জাতীয় কবিতা পরিষদ

প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল স্লোগান: জেলের তালা ভেঙেছি/শেখ মুজিবকে এনেছি/আমার নেতা তোমার নেতা / শেখ মুজিব শেখ মুজিব। মুহূর্মূহূ করতালি আর বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসের মধ্যে বঙ্গবন্ধু দাঁড়িয়ে মাইকে বক্তৃতা করলেন। ভোরের কুয়াশা ভেঙে জেগে ওঠা যমুনার তীর জুড়ে মানুষ আর মানুষ: প্রবল বন্যার মতো সেদিন মানুষের ঢল নেমেছিলো। তারপর, স্লোগানে মুখরিত জনতার ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে, মুগ্ধ হয়ে দুপুরের দিকে সদলবলে স্টিমারে চড়লেন সকলের প্রিয় নেতা শেখ মুজিব। যমুনার অথৈ জল তাঁকে পরম আদরে বুকে তুলে ভাসিয়ে নিয়ে চললো। বলা দরকার যে, সরিষাবাড়ি/ রেলস্টেশনে এবং জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে বঙ্গবন্ধুর দেয়া ভাষণ যেমন মানুষের ভিড়ে পেছন থেকে ভালো করে শুনতে পাইনি, তেমনি আমার মতো এক গাঁয়ের কিশোরের পক্ষে রাজনীতির ভাষা বোঝাও ছিল কষ্ট-কঠিন। কারণ, সব মানুষের লক্ষ্য ছিল তাদের প্রিয়নেতা 'শেখ সাহেব'কে এক নজর দেখা। টিকিটের বালাই নেই। পকেটে কোন পয়সা ছিলো না। পরে সারাদিন না খেয়ে ক্লান্ত দেহে বিকেলের ট্রেনে বাড়ি ফিরে আসি। আমরা মা-বাবা ধরেই নিয়েছিল যে, আমি নিশ্চয়ই সকলের সাথে জগন্নাথগঞ্জে চলে গেছি। মনে আছে, মা দুশ্চিন্তা করলেও আমার আওয়ামীলীগার বাবার চোখে-মুখে কোন দুশ্চিন্তার ছাপ দেখিনি। শেখ মুজিবকে দেখার অভিযানে তার শীর্ণকায় রোগা ছেলের ওপর বরং তিনি খুশিই হয়েছিলেন। বাড়ি এসে জানলাম- বাবাও সরিষাবাড়ী স্টেশনে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে এসেছেন। বঙ্গবন্ধুর প্রতি হাজার হাজার মানুষের ভালবাসা দেখে সেদিন থেকে আমার মধ্যেও তৈরি হয় মানুষের ভালবাসা পাওয়ার লোভ!

অতঃপর, সত্তরের নির্বাচনে বিশাল বিজয়, ৭ মার্চে রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত ঘোষণা 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'; ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা; সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ; ১৬ই ডিসেম্বর রক্তমূল্যে অর্জিত প্রিয় স্বাধীনতা; ১০ জানুয়ারি বাঙালির প্রাণপ্রিয় নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

তারপর, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আবার দেখি ১৯৭৩ সালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সম্মেলনে। তখন আমি কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র এবং সরিষাবাড়ি থানা ছাত্রলীগের গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক। যা হোক, সম্মেলনের আগের দিন এসে ঢাকা কলেজের দক্ষিণ হোস্টেলে উঠলাম। আমাদের স্কুলের এক সময়ের উপরের ক্লাসের ছাত্রলীগ নেতা বাদল ভাই এখানে থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন (বাদল ভাই ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তার হয়ে প্রয়াত হয়েছেন)। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে ঢাকা কলেজের উল্টোদিকে 'অন্তরঙ্গ' হোটেলে নাস্তা করে আমরা মিছিল করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গেলাম। এতো বড় প্যান্ডেল আর মঞ্চ জীবনে এই প্রথম দেখলাম। ছাত্রলীগের সম্মেলন উদ্বোধন করবেন বঙ্গবন্ধু। সবুজ ঘাসে আবৃত সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তখন অনেক চারাগাছ বাতাসে দুলছিল। চতুর্দিক থেকে ছাত্রলীগের মিছিল এসে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ভরে দিচ্ছিলো।

বেলা সাড়ে এগারোটা-কি-বারোটা নাগাদ বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এসে মঞ্চে উঠলেন। সমস্ত সোহরাওয়ার্দী উদ্যান প্রকম্পিত করে আমরা স্লোগান তুললাম- তোমার নেতা আমার নেতা/শেখ মুজিব শেখ মুজিব/এক নেতা এক দেশ/বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ। মঞ্চে বাংলাদেশে মুক্তবুদ্ধি চর্চার অন্যতম পথিকৃত সাদা ফুলশার্ট আর পায়জামা পরা লেখক-সাংবাদিক রণেশ দাশগুপ্ত ছিলেন। আমার মনে আছে বিকেলে তিনি- 'আবহমান বাংলার সংস্কৃতি' শীর্ষক বক্তৃতা করেছিলেন। প্রসঙ্গত ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবার নির্মম হত্যাকান্ডের পর তিনি ভারতে চলে গিয়েছিলেন। মৃত্যুর পর তার শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশে। জনান্তিকে বলি- ১৯৯২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে কলকাতার পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি জীবনানন্দ সভাগৃহে ভাষা শহীদ দিবসের আলোচনা সভায় অন্নদা শংকর রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও রণেশদার সঙ্গে আমার বক্তৃতা দেয়ার সৌভাগ্য হয়েছিলো।

যা হোক, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গিয়ে আমাদের স্কুলের আরেক বড়ভাই আউয়াল ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলো (পরে নিউইয়র্ক প্রবাসী ও প্রয়াত)। তাঁর পরনে বেল্টবটম নামক বেঢপ প্যান্ট দেখে বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলাম। তিনি আমাদের ফুচকা খাইয়েছিলেন। জীবনে ফুচকা খাওয়ার অভিজ্ঞতা সেই প্রথম! ছোটো থেকেই লেখাপড়া ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে আউয়াল ভাইয়ের আগ্রহ ছিল প্রবল। দেখলাম অনেক নেতার সাথে তাঁর পরিচয়। আউয়াল ভাই তাঁর পরিচিত ছাত্রলীগ-যুবলীগ-আওয়ামীলীগ নেতাদের কারো কারো সঙ্গে আমাদের হ্যান্ডশেক করিয়ে দিচ্ছিলেন আর মঞ্চের পাশ থেকে বড় বড় নেতাদের চিনিয়ে দিচ্ছিলেন। সেদিনই বাংলাদেশের স্বাধীনতা

সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম রূপকার যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মনিকে প্রথম দেখলাম ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। সেই সম্মেলনেই বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন-ছাত্রলীগের ইতিহাস, বাঙালির ইতিহাস। তখন ছাত্রদের মধ্যে ঘরে-বাইরে, গাছতলায়-ট্রেনের কামরায় তাস খেলার খুব প্রচলন ছিলো। সেদিনের ভাষণে জাতির জনক দুই হাতে তাস ভাঁজ করে ছড়িয়ে দেয়ার ভঙ্গি দেখিয়ে মজা করে ছাত্রদের এই বদ অভ্যাস ছাড়ার ইংগিত দিয়েছিলেন; সারাদেশের ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের পড়াশোনার অবসরে বাবা-মা'র কাজে সাহায্য করা ও দেশের সেবায় ঝাপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। তখন আমার মনে পড়েছিলো কবিতার পঙ্ক্তি: তাস খেলে কত ছেলে পড়া নষ্ট করে/ পরীক্ষা আসিলে তাদের চোখে জল পড়ে। সেদিনের সেই ভাষণের ছবি আমার চোখে ও হৃদয়ে সদা চলমান। আমি জীবনে আর তাসখেলা শিখিনি। জাতির পিতার সেই অনুকরণীয় ভঙ্গিমায় প্রদত্ত নির্দেশ পালন করেই অজপাড়াগাঁ থেকে হয়তো আজ আমি এখানে! সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ভাষণ দিয়ে চলে যাবার সময় বঙ্গবন্ধুকে আরেক নজর দেখার জন্য দৌঁড়ে তাঁর গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াই আমরা। তিন বছর পূর্বে রেলগাড়ির দরোজায় দেখা রোগা-শ্যামলা-ক্লান্ত বঙ্গবন্ধুকে তার স্বাধীন বাংলাদেশে '৭ই মার্চে রেসকোর্স'-এ আজ খুব আনন্দিত ও উৎফুল্ল দেখাচ্ছিলো। ভিড়ের মধ্যে হাস্যোজ্জ্বল বঙ্গবন্ধু তাঁর কাঁচখোলা গাড়ির দরজা নিজহাতে টেনে বন্ধ করে চলে গেলেন। জাতির পিতার সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখ আজও আমাকে আপ্লুত করে; আমাকে অশ্রুসজল করে!

উনিশ'শ পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট বিকেলে সুন্দরবন এক্সপ্রেসে আমাদের ঢাকা যাবার কথা ছিলো। প্যান্ট-শার্ট ইস্ত্রি করানোর জন্যে সকালে বাজারে যাচ্ছিলাম। তখন কয়লার ইস্ত্রিতে দুই আনায় একটা শার্ট বা প্যান্ট ইস্ত্রি করা যেতো। একটু দূর থেকে দেখলাম রাস্তার তেমাথায় জটলার মধ্যে একটা লোক রেডিও হাতে বসা আর সবাই খবর শুনছে। পরিচিত একজন দৌড়ে এসে খবর দিল শেখ সাহেবকে' মেরে ফেলা হয়েছে। হতবিহ্বল ও স্তব্ধ হয়ে মাটিতে বসে পড়লাম। অনেকক্ষণ উঠে দাঁড়াতে পারছিলাম না। কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। একটু পরে রেডিওর কাছে এগিয়ে গেলাম। রেডিও থেকে খুনী মেজর ডালিমের কণ্ঠে বাঙালির হাজার বছরের আদরের ধন; অমৃতের সন্তান বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর খবর শুনে অসাড় দেহে বাড়ি ফিরে গেলাম। অতঃপর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রলীগের কর্মী এবং একজন কবি-সংস্কৃতিকর্মী হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের আন্দোলনে সক্রিয় থেকেছি। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার সম্পন্ন ও আংশিক রায় কার্যকর করার জন্য বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে সকৃতজ্ঞ অভিবাদন জানাই।

ভেবে আরও অবাক হই- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত-মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের সঙ্গে যুক্ত করে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা সেদিনের সেই স্কুল বালককে চিরকৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ ও প্রণত করেছেন। এখানেও একটি ঘটনা আমার জীবনে আনন্দস্মৃতি হয়ে থাকবে। বঙ্গবন্ধুর 'মাতৃসমা' কন্যা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সযত্ন তত্ত্বাবধানে এবং বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদযাপিত হচ্ছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী- মুজিববর্ষ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে এ বছরের ২০ শে মার্চ ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় কমিটি' এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির'র প্রথম সভায় মুজিববর্ষের কার্যক্রম প্রণয়নে অসংখ্য প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। সভায় একশ বছরের ইতিহাসে যে ছাত্রের জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বোচ্চ গর্বিত বোধ করে, সেই ছাত্র বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের স্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মরণোত্তর সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদানের একটি প্রস্তাব করার সৌভাগ্য আমার হয়। পরে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিষদের সভায় প্রস্তাবটি আমি উত্থাপন করি এবং তা সর্বসম্মতক্রমে পাশ হয়। মুজিববর্ষে ৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতির পিতাকে মরণোত্তর সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গৌরবান্বিত হয়।

আমি দেশের বিরল সৌভাগ্যবান কবিদের একজন যে, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে উনিশশ তিরাশির মার্চে রচিত আমার মুজিব কবিতার একটি পঙ্ক্তি 'মুজিব আমার স্বাধীনতার অমর কাব্যের কবি'- স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলাদেশের দেয়ালে দেয়ালে উৎকীর্ণ হয়েছে; পোস্টারে মুদ্রিত হয়েছে। প্রায় চার দশক জুড়ে মুজিব ভক্তদের মুখে মুখে এই পঙক্তিটি উচ্চারিত হয়েছে; কবিতাটিতে সুরারোপ করেন প্রথমে চয়ন ইসলাম; এবং পরে, বিশেষ করে ফকির আলমগীর মুজিব সংগীত হিসাবে সারা দুনিয়ায় বাঙালিদের মধ্যে জনপ্রিয় করেছেন। মুজিব বর্ষে এই পঙক্তিটি চৌত্রিশতম জাতীয় কবিতা উৎসব ২০২০-এর মর্মবাণী এবং কবিতাটিকে উৎসব সংগীত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত আমি আরও গর্বিত যে, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার ৭১তম জন্মদিন উপলক্ষে আওয়ামীলীগ থেকে প্রকাশিত পোস্টারেও খঁচিত হয়েছে তাঁকে নিয়ে রচিত আমার "তুমি ভূমিকন্যা" কবিতার দুই পঙক্তি: "অগ্নিস্নানে শুচি হয়ে বারবার আসো/ তুমি ভূমিকন্যা- তুমি প্রিয় মাতৃভূমি। এইই তো জাতির পিতার যোগ্য পরম্পরা; এইই তো আমার মুজিববর্ষ।

মহা মানবের হাতের স্পর্শ

সৈয়দা আফরোজা বেগম

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের কালো রাতে এ দেশের কিছু বিশ্বাসঘাতকের নির্মম বুলেটের আঘাতে নিজ বাড়িতে সপরিবার নিহত হন বাঙালী জাতির অবিস্মরণীয় নেতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বারবার মনে পড়ছে একটি ঘটনার কথা যা একবার লিখেও ছিলাম। করোনায় ঘরবন্দী থেকে আবারও সে বিষয়ে স্মৃতিচারণ করতে ইচ্ছা হলো। এটি আমার জীবনের নানা স্মৃতির মধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় স্মৃতি যা বারবার বলতে ইচ্ছা করে।

১৯৬৯-৭০ হবে। ক্লাস সিক্স-সেভেনে পড়ি। আব্বা একদিন বললেন ইউনাইটেড স্কুলের মাঠে শেখ মুজিব এর ভাষণ শুনতে যাবেন সাথে আমাকেও নেবেন। মা বললেন অত মানুষজনের মধ্যে আমাকে নেওয়ার দরকার নেই। আব্বা শুনলেন না। আমিও বাবার নেওটা মেয়ে চললাম ইউনাইটেড স্কুলের জনসভায় । কিন্তু না, মাঠে লোক গিজগিজ করছে ঢোকা গেল না। অনেকে পাশের টি এন্ড টি অফিসের ছাদে উঠেছে। তাই দেখে আব্বাও দৌঁড়ালেন আমার হাত ধরে ঐ ছাদের উদ্দেশ্যে। তাঁর কথা, নেতাকে দেখা ও নেতার বক্তব্য কানে শোনা।

আমার আব্বা ছিলেন একজন সরকারি চাকরিজীবী মানুষ তবে অত্যন্ত রাজনীতি সচেতন। পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে তাঁর ছিল প্রচন্ড ক্ষোভ। তাই ৬৯-৭০ এর আন্দোলনে তাঁর ছিল অকুণ্ঠ সমর্থন আর তখনকার বাঙালীর একক আর অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন তাঁরও নেতা। সরকারি চাকরি করেও সবসময় পাকিস্তান বিরোধী কথা বলাসহ এ ধরনের সভা সমিতিতে তিনি প্রায়ই অংশ নিতেন; কারো নিষেধ শুনতেন না।

কুষ্টিয়া ইউনাইটেড স্কুলের মাঠে ঢুকতে না পেরে টি এন্ড টি অফিসের ছাদে দাঁড়িয়ে ভাষণ শোনার সময় চারপাশে তাকিয়ে দেখি অনেকে আশেপাশের গাছে উঠে ভাষণ শুনছে। সভা শেষ হওয়ার সাথে সাথে আব্বা আমার হাত ধরে ছাদ থেকে নেমে দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে ভীড় ঠেলে জনসভার মাঠে ঢুকে সোজা চলে গেলেন সভামঞ্চের কাছে নেতাকে কাছ থেকে এক নজর দেখবেন বলে।

আমি তো অত বুঝিনি তখন। তবে আজ থেকে প্রায় অনেক বছর আগের ঘটনা হলেও আমার পরিষ্কার মনে আছে যে, সাদা ধবধবে পাজামা পানজাবি পরা উঁচু লম্বা হাস্যময় সুদর্শন একজন মানুষ সভামঞ্চ থেকে নেমে একটি সাদা প্রাইভেট কারে উঠতে যাচ্ছে আর অগণিত মানুষ তাঁকে ছেঁকে ধরছে একটু কথা বলা আর হ্যান্ডশেক করার জন্য।

আমার আব্বা ধাক্কাধাক্কি করে এগিয়ে তার কাছে গিয়ে নিজে হ্যান্ডশেক করলেন আর আমার হাত এগিয়ে দিয়ে বললেন নেতা আমার মেয়ে একটু আপনার সাথে হ্যান্ডশেক করবে। তিনি হাসি মুখে আমার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। আর আব্বা গদগদভাবে খুশিতে ডগমগ হয়ে আমাকে নিয়ে বাড়ির পথে হাঁটা দিলেন। এ ঘটনা যখন ঘটে তখন আমার মনে তা তেমন আলোড়ন তোলেনি। তবে ঘটনাটি আমি কখনও কেন যেন ভুলতে পারিনি। যখন কলেজের বড় ভাইয়েরা আমাদেরকে স্কুল থেকে আয়ুব বিরোধী মিছিলে নিয়ে যেতেন তখন আর খবরের কাগজ পড়ে একটু একটু করে তাঁর সম্পর্কে জানতে পারি। জেনেছি তিনি শেখ মুজিবুর রহমান যাকে বাংলার মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার কারণে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেয়া হয়। এর থেকে সঠিক উপাধি আর হয়না। বাংলাদেশ আর বঙ্গবন্ধু একে অপরের পরিপূরক। বঙ্গবন্ধু আর বাংলাদেশ একে অপরের সমর্থক; একটি ছাড়া অপরটি অসম্পূর্ণ। তিনি যে আপামর বাঙ্গালী জাতির অবিস্মরণীয় নেতা এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ও আমাদের জাতির পিতা।

এরপর ৭০ এর নির্বাচন আর ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ। ৭১ এর শুরু থেকেই বাবা-চাচাদের মুখে নানা আলোচনা শুনি। মার্চের ০৭ তারিখে দেয়া বঙ্গবন্ধুর ভাষণ যখন রেডিওতে প্রচারিত হয় তখন বাড়ির সবাই রেডিও-র চারপাশে গোল হয়ে বসে সে ভাষণ শুনি,

---

লেখক: সৈয়দা আফরোজা বেগম, অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)

আর তাঁর ভাষণ শোনার পর আব্বা ও দুই চাচা বললেন তাঁরা কেউ বঙ্গবন্ধুর কথার বাইরে যাবেন না। আমাকেও প্রচন্ড আলোড়িত করে রেডিওতে শোনা নেতার সেই ঐতিহাসিক ভাষণ।

৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর দেয়া স্বাধীনতার ডাকের পর আমরা কেউ আর স্কুলে যাইনা। এরপর ২৫ মার্চের কাল রাত। মনে পড়ে ছোট চাচা বলতেন ২৫ তারিখের আলোচনা না শুনে তিনি ঢাকা যাবেন না, বিষয়টা তখন পরিষ্কার বুঝিনি। ২৬ মার্চের পর শুনি যুদ্ধ শুরু হয়েছে। প্রতিবেশী এক চাচা মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে স্কুলে যাওয়ার কথা বললে ছোট চাচা হাত উঁচিয়ে বললেন যতদিন না মুক্তিযুদ্ধ শেষ হবে বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে না আসবে ততদিন এ বাড়ির ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাবে না।

এ সময় তো বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী তখন তিনি যেন জীবিত থাকেন এবং ফিরে আসেন আমাদের মাঝে এজন্য আমার আম্মা যিনি একজন সাধারণ গৃহবধূ তিনিও নফল নামাজ পড়েন আর রোজা রাখেন ।

যেহেতু তখন আমরা স্কুলে যাইনা তাই সারাদিন বাবা-চাচাদের আলাপ আর স্বাধীন বাংলা বেতার শুনি। ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধই আমাকে দেশ নিয়ে ভাবতে শিখিয়েছে। কারণ এ যুদ্ধে খুব কাছে থেকেই কেবল দেখা না; আমরা মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়েই সে সময় গুলো পার করেছি।

নয় মাস যুদ্ধের পর দেশ স্বাধীন হয় বঙ্গবন্ধু ফিরে আসেন দেশটাকে নতুনভাবে গড়ার জন্য কাজ শুরু করেন। তখন তাঁকে কাছে থেকে দেখা, তাঁর সাথে হ্যান্ডশেক করার স্মৃতি মাঝে মাঝেই মনে পড়তো আর বেশ আলোড়ন তুলতো মনের মধ্যে। ১৯৭৫ এ কলেজে পড়ার সময় একদিন বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত শুনি দেশীয় ঘাতকদের গুলিতে তাঁর মৃত্যুর কথা। চারদিক কেমন যেন নিস্তব্ধ হয়ে যাচ্ছিল। আব্বা সব সময় মনমরা হয়ে থাকতেন, সে সময়ে মনে হয়েছিল যে আমরা আবার পরাধীন হয়ে গিয়েছি। আসলেও নিজ দেশে আমরা যেন সত্যিই আবার পরাধীনতার শৃঙ্খলে আটকে পড়েছিলাম।

বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর দেশ চলতে লাগলো উল্টো পথে। স্বাধীন দেশ হারাল স্বাধীনতার ডাক দেয়া মানুষটিরই নাম উচ্চারণ করার স্বাধীনতা। সব আবার পাকিস্তানি আদলে চলতে থাকলো। তখন আমার খুব বেশি করে মনে পড়তো বঙ্গবন্ধুর সাথে হাতে হাত মেলানোর অবিস্মরণীয় সেই স্মৃতির কথা আর প্রচন্ড কান্না পেত । আব্বাকে মনে হতো খুব আসহায়, ক্ষোভে ফুঁসতেন কিন্তু কাউকে কিছু বলতে পারতেন না।

১৯৯৬ এ ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পায়। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা হন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। আমি তখন পড়ালেখা শেষ করে বি সি এস পরীক্ষা দিয়ে সরকারি চাকরি করি, সংসার করি। সে সময় আমার আবার খুব মনে পড়তো বঙ্গবন্ধুর সাথে হ্যান্ডশেকের কথা। যে কারণে একদিন এক সিনিয়র কলিগকে খুব আবেগভরে সেই গল্প বলে ফেলি। কিন্তু তিনি হাসতে হাসতে উত্তরে যা বললেন তা শুনতে আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। তিনি বললেন বাহ আপনি তো এই গল্প বলে সরকারের কাছে থেকে অনেক সুযোগ সুবিধা নিতে পারেন। আমি তাঁর এ কথায় খুব বিব্রত হই, স্তম্ভিত হই, কষ্ট পাই আমার খুব খারাপ লাগে। আমি এত কষ্ট পাই এ কথা ভেবে যে আমি তো কোন সুযোগ সুবিধা নেয়ার জন্য আমার মনের ভেতরে সযত্নে লালন করা এ স্মৃতির কথা বলিনি বা স্বপ্নেও তা ভাবিনি। যাঁর কারণে বাংলাদেশের জন্ম যারা কোনদিন রাজনীতি করেনি বা বোঝেনি তারাও তাঁর জন্য তাঁর নামে যুদ্ধ করলো জীবন দিল, সাধারণ গৃহবধূরা যাঁর মুক্তির জন্য রোজা রাখলো, সেই মহা মানুষটির দল এতদিন পর রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে। তাঁরই সুযোগ্য কন্যা আজ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এটা আমার কাছে এবং আমার মত মানুষের কাছে এ এক পরম পাওয়া। এ আনন্দের কোন তুলনা নেই। আমাদের সেই আনন্দ অনুভূতি ধরে রাখতে না পেরে তা শেয়ার করার জন্যই বলেছিলাম এ মহান স্মৃতির কথা। বুঝিনি আমার আনন্দটাকে তিনি এভাবে অবমূল্যায়ন করে বিষাদে পরিণত করবেন।

শুধু আমার কাছে না আমার বাবা যাঁর কারণে ঐ মানবের হাতের ছোঁয়া লেগে আছে আমার হাতে যাঁর কারণে দেশের জন্য অনুভূতি কাজ করেছে সব সময় আমার সেই বাবা দেখে গেছেন তাঁর প্রিয় নেতার কন্যা শেখ হাসিনা তখন প্রধানমন্ত্রী হয়ে দেশ পরিচালনা করছেন। এটা দেখে মনে হতো বাবা যেন নতুন করে জীবন পেয়েছেন।

বাবার কাছ থেকেই প্রথম বঙ্গবন্ধুকে চিনেছি, বঙ্গবন্ধুকে চেনাতে আর জানাতে গিয়ে বাবা আমাদের মনে দেশপ্রেম সম্পর্কেও চেতনা জাগিয়েছেন। তিনি সবসময় বলতেন দেশপ্রেম চোখে দেখা যায়না, হাতে ধরা যায়না, তা অনুভবের বিষয়, কাজের মাধ্যমে তা প্রকাশ করতে হয়। সময়ের কাজ সময়ে করা, সততা মেনে চলা, কাজের প্রতি সৎ থাকা, মানুষের জন্য কাজ করা, মানুষকে কষ্ট না দেয়া, মানুষের বিপদের সময় এগিয়ে যাওয়া, অন্যায় না করা ইত্যাদি। এ গুলোই হলো দেশপ্রেমের বহিঃ প্রকাশ।

বাবার এ কথা আমি আজীবন মেনে চলেছি। আমার কর্ম জীবনে জানামতে কখনও অন্যায় কাজ করিনি; কাজ করতে গিয়ে অনেক সিনিয়রদের স্নেহের ও সুনজরে পড়েছি: কিন্তু কখনো কারো কাছ থেকে কোন রকম সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করিনি বা ভাবিও নি। ১৯৯৬ এ সিনিয়র সহকর্মীর ঐ কথা শোনার পর এত গুটিয়ে যাই যে যদি কেউ তাঁর মতই ভুল বোঝেন একথা চিন্তা করে বঙ্গবন্ধুর সাথে হ্যান্ডশেক করার সেই সুন্দর ও অবিস্মরণীয় স্মৃতির কথা মনের কোনেই রয়ে যায়। বলা হয়নি কাউকে আর।

তবে খুব কাছের সমমনা এক দু জনকে বলেছি কর্ম জীবনের শেষে এসে। তারা বলেছেন এরকম একটি ঐতিহাসিক স্মৃতির কথা আমার প্রকাশ করা উচিৎ। তাই এ স্মৃতিচারণ। এটা আমার জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ ঘটনা, শ্রেষ্ঠ স্মৃতি যা আমাকে দেশকে ভালবাসতে শিখিয়েছে আর অন্যায় থেকে খারাপ বা মন্দ কিছু থেকে দূরে থাকার সাহস জুগিয়েছে, লাভের হাতছানিকে দূরে ঠেলে সততার পথে থাকতে উৎসাহ দিয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহানায়ক ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহদাত বার্ষিকী ২০২০ ও জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঘোষিত মুজিব বর্ষ ২০২০-২০২১ উদ্‌যাপনের ঐতিহাসিক সময়ে আমার মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখা সেই সুন্দর মধুর আর অবিস্মরণীয় ও গর্ব মাখানো অম্লাণ স্মৃতিটুকু আবারো ছড়িয়ে দিতে চাই সবার মাঝে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন আকর্ষণ ধানমন্ডি-৩২

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর

আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের

১. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার নৃশংসভাবে হত্যার পর ১৯৮১ সালের ১০ই জুন পর্যন্ত এই বাড়িটি সামরিক কর্তৃপক্ষের অধীনে ছিল। ১৯৮১ সালের জুন মাসের ১০ তারিখে বাড়িটি বুঝে নেয়ার পর দুই বোন শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ঘোষণা করেছিলেন ঐতিহাসিক এই বাড়িটি হবে জনগণের। ১৯৯৪ সালের ১৪ আগস্ট ৩২ নম্বরের এই বাড়িটি “জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর” হিসেবে উদ্বোধন করা হয়।

প্রবেশের সময়সূচি : ১০.০০-৫.০০ (বুধবার সাপ্তাহিক ছুটি)
প্রবেশমূল্য : ০৫ টাকা

বি:দ্র: মোবাইল, ক্যামেরা ফ্রন্ট ডেস্কে জমা প্রদান করে প্রবেশ করতে হবে এবং অনুমতি ব্যতিরেকে ছবি তোলা সম্পূর্ণ নিষেধ।

২. বঙ্গবন্ধুর সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম : ইংরেজি- ১৭ মার্চ ১৯২০ (বুধবার)
জেলা : ফরিদপুর, মহকুমা গোপালগঞ্জ (মধুমতি নদীর তীরে)
ইউনিয়ন- পাটগাতী, গ্রাম-টুঙ্গীপাড়া (বাইগার নদীর তীরে)
ডাকনাম : খোকা (বাবা মা আদর করে ডাকতেন)
উচ্চতা : ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি
পিতা : শেখ লুৎফর রহমান
মাতা : সায়েরা খাতুন
দাদা : শেখ আব্দুল হামিদ
নানা : শেখ আব্দুল মজিদ (শেখ মুজিবুর রহমানের নাম রাখেন)

৩. ভবনের নিচতলা

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর পরিবারসহ আত্মীয় স্বজন যাদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়, তাদের সকলের পোট্রেট (ছবি) করিডোরে টানানো।

৪. করিডোর

ভবনের নিচতলায় অফিসকক্ষ ও বৈঠকখানার মাঝে একটি লম্বা করিডোর আছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে একসাথে তিনটি বাড়িতে (বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ৩২ নং সড়কের বাড়ি, আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের ৩৭ নং মিন্টো রোডের বাড়ি, শেখ ফজলুল হক মনির ধানমন্ডির নতুন ৫/এ সড়কের ৬১ নম্বর বাড়ি) ঘাতকরা হত্যাযজ্ঞ চালায়। বর্তমানে করিডোরে পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালের উপরে বঙ্গবন্ধুর বাড়িসহ অন্য দুটি বাড়িতে যাঁদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে তাদের পোট্রেট টানানো আছে। ক্রমানুসারে তাঁদের নাম দেয়া হলো- (১) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (২) বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব (বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী) (৩) শেখ কামাল (বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র) (৪) শেখ জামাল (বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় পুত্র) (৫) শেখ রাসেল (বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র) (৬) শেখ আবু নাসের (বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ ভাই) (৭) সুলতানা কামাল খুকী (শেখ কামালের স্ত্রী) (৮) পারভীন জামাল রোজী (শেখ জামালের স্ত্রী)

লেখক: আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের, পরিচালক (যুগ্মসচিব), বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

(৯) আব্দুর রব সেরনিয়াবাত (বঙ্গবন্ধুর সেজ বোনের স্বামী) (১০) শেখ ফজলুল হক মনি (বঙ্গবন্ধুর মেজ বোনের বড় ছেলে) (১১) বেগম আরজু মনি (শেখ ফজলুল হক মনির স্ত্রী) (১২) কর্ণেল জামিল উদ্দিন আহমেদ (বঙ্গবন্ধুর প্রধান নিরাপত্তা অফিসার) (১৩) বেবী সেরনিয়াবাত (আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের কনিষ্ঠ কন্যা) (১৪) আরিফ সেরনিয়াবাত (আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের কনিষ্ঠ পুত্র) (১৫) সুকান্ত আব্দুল্লাহ বাবু (আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের জ্যেষ্ঠ পুত্র) (১৬) শহীদ সেরনিয়াবাত (আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের ভাইয়ের পুত্র) (১৭) আবদুল নঈম খান রিন্টু (আওয়ামীলীগ নেতা আমীর হোসেন আমুর খালাতো ভাই)।

৫. বৈঠকখানাঃ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬১ সালের ১ অক্টোবর সপরিবার এই বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। তারপর থেকেই নিচতলার এই কক্ষটিকে বৈঠকখানা হিসেবে ব্যবহার করেছেন। নিচতলার এই বৈঠকখানাটি সর্বশ্রেণির মানুষের জন্য উন্মুক্ত ছিল। ৭ মার্চ ১৯৭১ সালের পর থেকে এই বৈঠকখানা থেকেই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা মোতাবেক বাঙ্গালি জাতি পরিচালিত হত। এই ঐতিহাসিক বাড়িটি জাদুঘরে রূপান্তরিত হওয়ার পর বৈঠকখানাটি বঙ্গবন্ধুর ব্যবহৃত আসবাবপত্র, বিভিন্ন সময়ে তোলা বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান ও রাষ্ট্রীয় অতিথিদের সঙ্গে তোলা আলোকচিত্র এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশ, সংগঠন ও ব্যক্তির নিকট থেকে পাওয়া উপহার সামগ্রী দর্শণার্থীদের জন্য প্রদর্শিত হচ্ছে।

৬. বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার

বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারটি ছিল বঙ্গবন্ধুর শয়ন কক্ষ। ১৯৬৬ সালে দ্বিতীয় তলার নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নিচতলার এই কক্ষেই শেখ রাসেলকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু দম্পতি বসবাস করতেন। দ্বিতীয় তলায় বসবাস শুরু হলে বঙ্গবন্ধু এই কক্ষটিকে ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার হিসেবে ব্যবহার করতেন। এই গ্রন্থাগারে বঙ্গবন্ধু রবীন্দ্র রচনাবলি, শরৎচন্দ্র, নজরুল রচনাবলি, বার্নার্ড শ, বার্ট্রান্ড রাসেল, শেলী, কীটসসহ অসংখ্য লেখকের বই পড়তেন ও সংগ্রহে রাখতেন। এই গ্রন্থাগারের দক্ষিণ পাশের দরজার কাছে টেলিফোন সেট ছিল। ওই জায়গায় দাঁড়িয়ে জাতির পিতা স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এই ঘোষণা বাংলাদেশের সর্বত্র ওয়ারলেস, টেলিফোন ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে প্রেরিত হয় এবং পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ওয়ারলেসের মাধ্যমে চট্টগ্রামে পৌঁছে দেয়া হয়।

৭. অফিস কক্ষ

বঙ্গবন্ধু ভবনের মূল প্রবেশদ্বার (Main Gate) দিয়ে ঢুকতেই প্রথমে চোখে পড়বে নিচতলার অফিস কক্ষটি। বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী এবং পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন এই কক্ষটি তাঁর পিএ মহিতুল ইসলাম অফিস হিসেবে ব্যবহার করতেন। কক্ষে পশ্চিমমুখি একটি ও পূর্বমুখি দুইটি দরজা আছে। এটি অভ্যর্থনা কক্ষ হিসেবেও পরিচিত ছিল। এই অফিস কক্ষের দেয়ালে ঘাতকদের নিক্ষিপ্ত গুলির ক্ষতচিহ্ন এখনো বিদ্যমান। বর্তমানেও এই কক্ষটি জাদুঘরের অফিস কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৮. শেখ রাসেলের জন্মঘর

বঙ্গবন্ধু ভবনের নিচতলায় উত্তর-পূর্ব দিকে কক্ষটি অবস্থিত। বাড়িতে ওঠার প্রথম দিকে (১৯৬১ সালের ১ অক্টোবর) এই ঘরে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা থাকতেন। ১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর দিবাগত রাত ১.৩০ মিনিটে শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল এই ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৬ সালে দোতলার কক্ষগুলো নির্মাণ শেষ হলে তারা দোতলায় বসবাস শুরু করেন এবং পরবর্তীতে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনরা এসে এই ঘরে থাকতেন।

৯. ডাইনিং কাম পারিবারিক বৈঠকখানা

দ্বিতীয় তলার এই কক্ষটি ছিল ডাইনিং স্পেস এবং পারিবারিক বৈঠকখানা। এই কক্ষে ঢুকতেই প্রথমেই দৃশ্যমান ডাইনিং টেবিল, এখানে বসে জাতির জনক ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ খাবার খেতেন। বঙ্গমাতা নিজ হাতে বঙ্গবন্ধুসহ পরিবারে সদস্য এবং আগত অতিথিদেরকে এই কক্ষেই খাদ্য পরিবেশন করে খাওয়াতেন। এই খাবার টেবিলে বঙ্গবন্ধু এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের ব্যবহৃত জগ, গ্লাস, প্লেট, চায়ের কাপ, চামচ, ছুরি ও অন্যান্য জিনিসপত্র এখনও দৃশ্যমান রয়েছে। এখনো এই কক্ষে বেগম মুজিবের

হাতের তৈরি আচারের বৈয়মসহ অন্যান্য স্মৃতি প্রদর্শিত রয়েছে। এই কক্ষে শেখ রাসেলের প্রিয় দুইটা সাইকেল এবং একটা কোকাকোলা প্রদর্শিত রয়েছে। একটি টিনে রাখা কিছু আতপ চাল রয়েছে।

১০. বঙ্গমাতা বেগম মুজিবের রান্নাঘর

বঙ্গবন্ধু ভবনের উত্তরে নিচতলায় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুনেছার রান্নাঘরটি অবস্থিত। রান্নাঘরটি মূল ভবনের সাথে সংযুক্ত নয়, তবে মূলভবনের সাথে লাগোয়া। বঙ্গমাতা বেগম শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব দোতলায় বসবাস করতেন তাই তিনি এই রান্নাঘরে যাতায়াতের জন্য একটি আলাদা সিঁড়ি তৈরি করেন। এই সিঁড়ি দিয়ে বেগম মুজিব দোতলা থেকে নেমে রান্নাঘরে পরিবারের সকল সদস্যদের জন্য রান্না করতেন এমনকি বাড়িতে আসা আত্মীয়-স্বজন, রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের জন্য নিজ হাতে রান্না করতেন। আজ আমাদের মাঝে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব নেই কিন্তু তাঁর রান্নাঘরটি এবং তার ব্যবহৃত হাড়ি-পাতিল, বটি, কলস, চুলা অন্যান্য সরঞ্জাম দর্শনার্থীদের জন্য প্রদর্শিত হচ্ছে।

১১. বঙ্গবন্ধুর শয়নকক্ষ

দোতলার বঙ্গবন্ধুর এই শয়নকক্ষটিতে মুজিব দম্পতি তাদের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলকে নিয়ে ১৯৬৬ সালের প্রথম দিকে বসবাস শুরু করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাতে নরপিশাচ ঘাতকেরা নির্মমভাবে হত্যা করেছিল বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামালের নব পরিণীতা স্ত্রী সুলতানা কামাল খুকু, মেজো ছেলে শেখ জামাল, শেখ জামালের স্ত্রী পারভীন জামাল রোজী, সাড়ে ১০ বছরের নিষ্পাপ শিশু কনিষ্ঠপুত্র শেখ রাসেল এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিবকে। ঘাতকের দল শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, বাড়িটি লুটপাট করে প্রতিটি কক্ষ তছনছ করে রেখে যায়। আজও প্রদর্শিত হচ্ছে কক্ষের পূর্বপাশের দেয়ালে কাঁচ দিয়ে ঢাকা রক্তের দাগ এবং মেঝেতে ঘাতকদের নিক্ষিপ্ত অসংখ্য গুলির চিহ্ন (কাঁচ দিয়ে ঢাকা)। ছাদের উপরে ঘাতকদের নিক্ষিপ্ত গুলির আঘাতে শেখ জামাল বা শেখ রাসেলের উৎক্ষিপ্ত শুকিয়ে যাওয়া মগজের সাথে মাথার কয়েকটা চুল কাঁচ দিয়ে ঢাকা। জাতির জনকের বিছানার পাশের টেবিল, ড্রেসিং টেবিল, ছোট ডেস্ক টেবিল, পড়ার টেবিল এবং টেবিলের উপর রাখা বেগম মুজিবের পানের বাটায় ছোপ ছোপ ও ছিটা ছিটা রক্তের দাগ আজও প্রদর্শিত রয়েছে। এই কক্ষে হত্যাকারীরা নারকীয় হত্যাকান্ড চালিয়েছিল। ওই কক্ষে বঙ্গমাতার ঠিকানায় প্রেরিত মুখবন্ধ অবস্থায় আজও সংরক্ষিত রয়েছে একটি চিঠি।

১২. পিতার রক্তে ভেজা সিঁড়ি

এটি এই বাড়ির মূল সিঁড়ি। এই সিঁড়ি দিয়ে বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবারের সদস্যগণ এবং অন্যান্যরা যাতায়াত করতেন। এই সিঁড়িতেই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। যখন পাষন্ড হত্যাকারীরা ৩২ নং এর ঐতিহাসিক বাড়িটিতে আক্রমণ চালিয়ে মুহুর্মুহূ গুলি করেছিল তখন জাতির পিতা এই সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছিলেন কারা তাঁর বাড়িতে আক্রমণ করেছে সেটা দেখার জন্য। বঙ্গবন্ধু সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন আর ঘাতকদল সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছিল বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যা করার জন্য । অকুতোভয়, অবিচল বঙ্গবন্ধুকে দেখে সবার সামনে থাকা ঘাতকদলের সদস্য ল্যান্সার মহিউদ্দিন ভড়কে যায়। তাকে সরতে বলে বজলুল হুদা এবং নূর চৌধুরী স্টেনগান চালায়। সিঁড়িতেই লুটিয়ে পড়েন জাতির পিতা। সঙ্গে সঙ্গে বাংলার গৌরব রবি যায় অস্তাচলে। এই সিঁড়িতেই রক্তে রঞ্জিত হয়েছে স্বদেশের মানচিত্র, লাল সবুজের পতাকা, সবুজ মাঠ, শস্যখেত আর নদ-নদী-সাগর।

১৩. শেখ রেহানার কক্ষ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৫৭ সালে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। দোতলার শেখ রেহানার এই শয়নকক্ষটির সাথে দক্ষিণে বড় খোলা বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক বারান্দা। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকেরা এই কক্ষটিতে লুটপাট ও তছনছ করেছিল। বর্তমানে এই কক্ষটি শেখ রেহানা প্রদর্শনী গ্যালারি নামে পরিচিত। এই কক্ষে প্রদর্শিত হচ্ছে জাতির পিতার পারিবারিক ও রাজনৈতিক জীবনের বেশ কিছু আলোকচিত্র।

১৪. শেখ জামালের কক্ষ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যম পুত্র শেখ জামাল ২৮ এপ্রিল ১৯৫৪ সালে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। শেখ জামাল একজন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। ১৫ই আগস্ট কালরাতে শেখ জামালের এই কক্ষটিতেও ঘাতকদল লুটপাট করে এবং এলোপাথাড়ি গুলি করে সবকিছু তছনছ করে রেখে যায়। এই কক্ষের মেঝেতে, দেয়ালে, ছাদে হত্যাকারীদের নিক্ষিপ্ত অসংখ্য গুলির চিহ্ন কাঁচ দ্বারা আবৃত করে প্রদর্শিত হচ্ছে। এই কক্ষে বর্তমানে প্রদর্শিত হচ্ছে শেখ জামালের বিয়ের নাগরা জুতা, সেনাবাহিনীর পোশাক, তার খেলার সরঞ্জাম, রোজী জামালের শাড়ি এবং তাদের দুইজনের সাদাকালো আলোকচিত্রসহ তাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন নিদর্শন।

১৫. বারান্দা-নেতা ও জনতা

বঙ্গবন্ধু ভবনের দোতলার দক্ষিণে এই ঐতিহাসিক বারান্দার অবস্থান। এই ঐতিহাসিক বারান্দাটিতে বঙ্গবন্ধুর কক্ষ, শেখ রেহানার কক্ষ ও শেখ জামালের কক্ষ থেকে প্রবেশ করা যেত। ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে প্রতিদিন হাজার হাজার জনতা এই বাড়ির সামনের রাস্তায় হাজির হত বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা নেয়ার জন্য। বঙ্গবন্ধু দোতলার এই ঐতিহাসিক বারান্দা থেকে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে তাঁর অভিব্যক্তি প্রকাশ করতেন এবং মাঝে মাঝে বারান্দার সাথে লাগোয়া ছোট ছাদে নেমে হাত নাড়িয়ে জনতার অভিবাদন গ্রহণ করতেন এবং সঠিক দিকনির্দেশনা দিতেন।

১৬. শেখ কামালের কক্ষ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল ১৯৪৯ সালের ৫ই আগস্ট গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিন তলার এই কক্ষের সামনে ছাদে বসে মাঝে মাঝে গান অনুশীলন করতেন। ১৯৭৫ সালের ১৪ জুলাই বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয় সু-খ্যাত সুলতানা খুকীর সাথে তার বিয়ে হয়। ১৪ই জুলাই বিয়ের পর তিনি স্ত্রী সুলতানা খুকীর সাথে তিন তলার এই কক্ষে বসবাস শুরু করেন। বিছানার পাশে টেবিলে আজও প্রদর্শিত রয়েছে ১৫ই আগস্ট রাতে ব্যবহৃত পানির গ্লাস, প্লেট ও চামচ। শেখ কামালের সেতার, কীবোর্ড, সাউন্ড বক্স, গানের রেকর্ড ও তার খেলাধুলায় পদক, সনদ এবং শীল্ড আজও প্রদর্শিত হচ্ছে। এই কক্ষের দক্ষিণের জানালার কাঁচে একটি গুলির চিহ্ন রয়েছে।

১৭. অপেক্ষা কক্ষ

তৃতীয় তলায় শেখ কামালের কক্ষের দক্ষিণ দিকে এই অফিস কক্ষ ও বৈঠকখানাটি অবস্থিত। এই কক্ষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একান্তে গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ আলোচনা করতেন এবং দেশি-বিদেশি গণ্যমান্য অতিথিদের সঙ্গে বৈঠক করতেন। এই কক্ষের ভেতরে একটি বড় শোকেসে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন সংগঠন ও সাধারণ জনগণের কাছ থেকে উপহার পাওয়া ছোট আকৃতির কিছু নৌকা, জাতীয় প্রতীক শাপলা, ইলিশ মাছ ও বাংলাদেশের মানচিত্র সাজিয়ে রেখে দর্শনার্থীদের জন্য প্রদর্শিত হচ্ছে। এই কক্ষের প্রবেশদ্বার এখনও দর্শকদের প্রদর্শনের জন্য উন্মুক্ত করা হয়নি তবে দর্শকগণ জানালা দিয়ে কক্ষটি অবলোকন করতে পারবেন।

১৮. অফিস কক্ষ ও পড়ার ঘর

তৃতীয় তলার সর্বশেষ কক্ষটি ছিল পড়ার ঘর। রাজনৈতিক কারণে এই বাড়িতে সবসময় অনেক লোকের সমাগম থাকতো। এই কক্ষে বসে বঙ্গবন্ধু একান্তে লেখাপড়া করতেন। বাড়ির ছেলে মেয়েরা পরীক্ষার সময় নিরিবিলি পরিবেশে লেখাপড়ার জন্য এই কক্ষটি বেশির ভাগ সময় ব্যবহার করতেন। এই কক্ষটি বঙ্গবন্ধু দাপ্তরিক কাজেও ব্যবহার করতেন। এই কক্ষটিতে শেখ রাসেলের বেশ কিছু খেলনা প্রদর্শিত রয়েছে। এই কক্ষের টেবিলের উপর বঙ্গবন্ধুর ব্যবহৃত একটি কলম, দেশি বিদেশি লেখকদের কিছু বই এবং দুইটি টেলিফোন সেট প্রদর্শিত রয়েছে।

১৯. প্রদর্শনী গ্যালারি-৩ দ্বিতীয় তলা

১. শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগ ১৯৭৪-৭৫
২. আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বঙ্গবন্ধু।
৩. উন্নয়ন ১৯৭৪ সাল থেকে ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫।
৪. রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামীলীগ গঠন এবং দ্বিতীয় বিপ্লব (২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ থেকে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫)।
৫. বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবার।
৬. ১৫ আগস্ট ১৯৭৫।

২০. প্রদর্শনী গ্যালারি-২ তৃতীয় তলা

শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগ ১৯৭১-১৯৭৩

১. ৭ই মার্চ ১৯৭১ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণ।
২. অসহযোগ আন্দোলন, স্বাধীনতার ঘোষণা, গণহত্যা, মুজিবনগর সরকার গঠন ও মুক্তিযুদ্ধ।
৩. বিশ্ব জনমত ও প্রবাসী বাঙালির ভূমিকা।
৪. স্বদেশ প্রত্যাবর্তন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু এবং যুদ্ধপরবর্তী দেশ পুনর্গঠন (১০ জানুয়ারি থেকে ১৯৭২)
৫. সংবিধান প্রণয়ন ১৯৭২।
৬. নির্বাচন ও পুনর্গঠন ১৯৭৩।

২১. প্রদর্শনী গ্যালারি-১ চতুর্থ তলা

শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ ১৯২০-১৯৭০

১. বঙ্গবন্ধুর বাণী।
২. বঙ্গবন্ধুর বংশ পরিচয়, টুঙ্গীপাড়া ও বাল্যজীবন।
৩. ছাত্র জীবন (১৯৪২-১৯৪৮)।
৪. ভাষা আন্দোলন
৫. যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, মন্ত্রিসভার সদস্য পদ লাভ ও পদত্যাগ (১৯৫৩-১৯৫৭)।
৬. সামরিক শাসন ও গ্রেফতার (এনডিএফ ও মৌলিক গণতন্ত্র ১৯৫৮-১৯৬৪)।
৭. ছয় দফা প্রণয়ন ও আন্দোলন (১৯৬৬)
৮. আগরতলা মামলা, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ও বঙ্গবন্ধু উপাধি (১৯৬৮-১৯৬৯)।
৯. নির্বাচন ১৯৭০।

২২. ১৫ আগস্ট ১৯৭৫, হিংস্র সেনাদের গুলিতে বঙ্গবন্ধুর সাথে আরো যাঁরা নিহত হয়েছেন

শুক্রবার, ২৯ শ্রাবণ ১৩৮২, ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ সাল। ফজরের আযান শুরু হয়েছে মাত্র। ধানমন্ডি ৩২ নং সড়কে হঠাৎ সামরিক জীপ ও ভারী ট্যাংকের ছোটাছুটির শব্দ। তারপর মুহূর্মুহূ গুলির আওয়াজ। শুরু হয় ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকান্ড। জাতির পিতার রক্তে ভেসে যায় ৩২ নম্বর বাড়ির সিঁড়ি। একে একে ঘাতকরা হত্যা করে বেগম মুজিব, শেখ কামাল, শেখ জামাল, নব-পরিণীতা সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল এবং শেখ রাসেল ও বঙ্গবন্ধুর ছোট ভাই শেখ আবু নাসের কে। ৩২ নম্বরের এ বাড়িতে ঘাতকরা হত্যা করে মোট ৯ জনকে। এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্য ছিল ৮ জন এবং একজন স্পেশাল ব্রাঞ্চের এ্যাসিস্টান্ট সাব ইন্সপেক্টর সিদ্দিকুর রহমান। হত্যা করা হয়েছিলো নিরাপত্তা কর্মকর্তা কর্ণেল জামিলকে। তিনি বঙ্গবন্ধু ভবনে আক্রমণের কথা শুনে ছুটে আসেন সেদিন। কিন্তু ঘাতকরা তাকে এ বাড়িতে পৌছার আগেই গুলি করে মেরে ফেলে। একই সঙ্গে ঘাতক চক্র আক্রমণ করেছিল মিন্টু রোডের আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের বাসায় এবং হত্যা করেছিল বঙ্গবন্ধুর ভগ্নিপতি কৃষিমন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও তার কন্যা বেবী, পুত্র আরিফ, নাতি সুকান্ত আব্দুল্লাহ বাবু, ভ্রাতুষ্পুত্র শহীদ সেরনিয়াবাত এবং বেড়াতে আসা আত্মীয় আব্দুল নঈম

খান রিন্টুকে। এছাড়াও দুজন কাজের লোক পটকা এবং লক্ষ্মীর মাকেও রেহাই দেয়নি ঘাতকরা। মিন্টু রোডের ৩৭ নং বাড়িতে মোট আটজনকে হত্যা করেছিলো ঘাতকদল। একই সময়ে ঘাতকরা আরো আক্রমণ করেছিল শেখ ফজলুল হক মণির ধানমন্ডির (রোড নং-৫/এ বাসা নং-৬১) বাসায়। বুলেটের আঘাতে হত্যা করেছিল শেখ মণি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী বেগম আরজু মণিকে। এছাড়াও ধানমন্ডির ৩২ নং এ নিক্ষেপকৃত শেল ছুটে গিয়ে আঘাত করেছিল মোহাম্মদপুর এলাকার নিরীহ মানুষের উপর।

২৩. বঙ্গবন্ধুর সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম : ইংরেজিঃ ১৭ মার্চ ১৯২০ (বুধবার)

জেলা : ফরিদপুর, মহকুমাঃ গোপালগঞ্জ (মধুমতি নদীর তীরে)

ইউনিয়ন : পাটগাতী, গ্রামঃ টুঙ্গীপাড়া (বাইগার নদীর তীরে)

ডাকনাম : খোকা (বাবা-মা আদর করে ডাকতেন)

উচ্চতা : ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি

পিতা : শেখ লুৎফর রহমান (গোপালগঞ্জ আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন-যারা আদালতের নথিপত্র সংরক্ষণ করেন)

মাতা : সায়েরা খাতুন

দাদা : শেখ আব্দুল হামিদ

নানা : শেখ আব্দুল মজিদ (শেখ মুজিবুর রহমানের নাম রাখেন)

শেখ মুজিবের দাদা এবং নানা আপন ভাই ছিলেন এবং মা ও বাবা চাচাতো ভাই-বোন ছিলেন।

২৪. বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাজীবন

১৯৩৪ সালে ১৪ বছর বয়সে মাদারীপুর ইসলামিয়া হাইস্কুলে ৭ম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হন। বেরিবেরি রোগে হার্ট দুর্বল হয়। ভিটামিন বি১ (থায়ামিন) এর অভাবে বেরিবেরি রোগ হয়। ডা. ছিলেন শিবপদ ভট্টাচার্য, একে রায় চৌধুরী। ১৯৩৬ সালে তিনি গ্লুকোমা রোগে আক্রান্ত হন এবং তাঁর চিকিৎসক ছিলেন কলকাতার ডা. টি আহমেদ। ১৯৩৭ সালে ভর্তি হন গোপালগঞ্জ মাথুরানাথ মিশনারি স্কুলে এবং ৩ বছর বন্ধ থাকার পর আবার পড়ালেখা শুরু করেন। তাঁর গৃহ শিক্ষক ছিলেন- কাজী আব্দুল হামিদ এমএসসি। তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের কর্মী ছিলেন। তাঁর হাতে শেখ মুজিবের রাজনীতির হাতে খড়ি।

১৯৩৯ সালে নবম ও ১৯৪০ সালে দশম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। ১৯৪১ সালে জ্বর থাকায় এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বাংলায় পাস করতে পারেননি। ১৯৪২ সালে এন্ট্রান্স (এসএসসি) পাস করেন। তিনি কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে (বর্তমান মাওলানা আজাদ কলেজ) আই.এ ভর্তি হন। বেকার হোস্টেলের ২৪ নং কক্ষে থাকতে শুরু করেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিতে বেকার হোস্টেলের ২৩ নং রুম গ্রন্থাগার এবং ২৪ নং রুম মিউজিয়াম হিসেবে তৈরি করেছেন। ১৯৪৭ সালে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। পাঠ্য বিষয় ছিল ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান। এ বছরই (১৯৪৭) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ল'ক্লাসে ভর্তি হন।

২৫. বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনঃ

১৯৩৮ সালে গোপালগঞ্জ যান প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক ও শ্রম, বাণিজ্য ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী। শেখ মুজিব তাদের কাছে স্কুলের ছাত্রাবাস সংস্কারের দাবি জনান। ১৯৩৯ সালে মুসলিম ছাত্রলীগে যোগ দেন। ১৯৪০ সালে নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন। ১৯৪৩ সালে মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন ও সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৫ সালে ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের জি এস নির্বাচিত হন। ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সব বিরোধী দল মিলে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। ১৯৫৪ সালের ১০ মার্চ সাধারণ নির্বাচনে ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৩ আসনে বিজয়ী হন। ১৯৫৪ সালের ১৪ মে বঙ্গবন্ধু যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় কৃষি, ঋণ, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক এবং সর্বকনিষ্ঠ মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৫৫ সালের ৫ জুন বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ এইড দপ্তরের মন্ত্রী হন। ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলগুলোর জাতীয় সম্মেলনে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর বাসভবনে ঐতিহাসিক ৬ দফা পেশ করেন। ১৯৬৬ সালের ২০ মার্চ দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭০ এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে এক যুগান্তকারী ভাষণে

ঘোষণা করেন, “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম”। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাত শেষে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন-১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭২ সালের ৭ মার্চ নতুন সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে জাতির জনকের নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯২টি আসনে বিজয়ী হয়। ১৯৭৩ সালে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৭৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ, সিপিবি ও ন্যাপের সমন্বয়ে ত্রিদলীয় ঐক্যজোট গঠন করেন। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি পুনরায় রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন। ১৯৭৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি এক ডিক্রির মাধ্যমে সমস্ত রাজনৈতিক দলের সম্মেলনে “বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)” নামে একটি নতুন একক রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকের গুলিতে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িতে সপরিবার নিহত হন।

পর্যটন শিল্প বিকাশে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন

ড. মল্লিক আনোয়ার হোসেন
শামীমা নাসরীন

বাংলাদেশকে 'এশিয়ার সুইজারল্যান্ড' এবং কক্সবাজারকে 'এশিয়ার জেনেভা' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন নিয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পর্যটন শিল্পের বিকাশ এবং সারা বিশ্বে বাংলাদেশকে তুলে ধরে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। দেশের প্রতি প্রবল মমত্ববোধ ও ভালবাসায় তিনি বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছেন, আস্বাদন করেছেন এ দেশের প্রকৃতির সৌন্দর্য্য। স্বপ্ন দেখেছিলেন অপার সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প নিয়ে।

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন ছিল বহুমাত্রিক। জাতির পিতার বহুমাত্রিক উন্নয়ন দর্শনে পর্যটন শিল্প এবং এর উন্নয়ন একটি অত্যাবশ্যক উপাদান ছিল। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে বিজয় অর্জনের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুর্নগঠন ও দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, বঙ্গবন্ধু তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে বুঝেছিলেন। উপলব্ধি করেছিলেন বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অপার সম্ভাবনা। তাই স্বাধীন বাংলাদেশের পরিকল্পনা কমিশনের প্রথম উদ্যোগ থেকেই এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশের পর্যটন উন্নয়ন একটি মৌলিক উপাদান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। একজন স্বপ্নদ্রষ্টার এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা আপ্তবাক্যের মতোই ছিল। বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলাদেশকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার জন্য বহুমাত্রিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। পর্যটন শিল্প বিকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরার প্রয়াসে প্রয়োজনীয় আইনী কাঠামোসহ তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় সৃজিত হয় 'দি বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন অর্ডার, ১৯৭২ (১৯৭২ সালের ১৪৩ নম্বর আদেশ) এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন। যাত্রা শুরুর পর থেকে পর্যটন অবকাঠামো নির্মাণ এবং মানবসম্পদ সৃষ্টির কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন (বাপক)। পর্যটন শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার প্রয়াস নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিল। সে পথ ধরেই এ দেশের পর্যটন শিল্প বিকাশের সূচনা হয়। পর্যটন খাতের বিকাশ ও উন্নয়ন বঙ্গবন্ধুর অগ্রাধিকার তালিকায় সবসময় স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভালবাসা এবং বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস তাঁকে পর্যটন খাত উন্নয়নে অনুপ্রাণিত করেছিল। কক্সবাজারকে আন্তর্জাতিকমানের পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি প্রণয়ন করেন মাস্টার প্ল্যান। শুধু তাই নয়, কক্সবাজারে সমুদ্র সৈকতের নান্দনিকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সৈকত সংলগ্ন ঝাউবন নিজের হাতে রোপন করেছিলেন (আলম, ২০১৬)। মাস্টার প্ল্যানের আওতায় বাংলাদেশকে 'এশিয়ার সুইজারল্যান্ড' হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

পর্যটন খাতে বঙ্গবন্ধুর সৃজনশীলতা ও দূরদর্শিতায় 'দি বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন অর্ডার, ১৯৭২' এ সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। অর্ডারটি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের সম্প্রসারণ, সুষ্ঠু পরিচালনা ও উন্নয়নের উদ্দেশ্য বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন সৃষ্টি করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। এ অর্ডারে স্পষ্টভাবে কর্পোরেশনের কার্যাবলি ও ক্ষমতা বর্ণিত হয়েছে। ১৯৭৩ সালে সৃষ্টি লগ্নের পর থেকে এটি ছিল সরকারিভাবে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত একমাত্র প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় পর্যটন প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পর্যটন সেবা দেশে-বিদেশের মানুষ যাতে উপভোগ করতে পারে সেজন্য বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা মোতাবেক এ প্রতিষ্ঠানটির কার্যাবলি ও ক্ষমতা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল। তন্মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনকে প্রদান করা হয়েছিল। আদেশের ধারা ৫ এর ২ (ক) তে উল্লেখ রয়েছে বাপক এর "পর্যটন উদ্যোগসমূহের সম্প্রসারণ এবং পর্যটন স্থাপনা ও সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ" করার ক্ষমতা থাকবে। বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করলে 'নিয়ন্ত্রণ' শব্দটি কতটা গুরুত্ববহ সেটি অনুধাবন করা যায়। পর্যটন সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ এ বিষয়টির অন্তর্ভুক্তির ফলে মহামারি, প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ সরকার প্রয়োজনে পর্যটন

লেখক: ড. মল্লিক আনোয়ার হোসেন, যুগ্মসচিব, এবং শামীমা নাসরীন, উপসচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

আকর্ষণীয় স্থানে পর্যটক প্রবেশে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। এটি বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা প্রমাণ করে। অর্থাৎ তিনি একটি অর্ডারের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের বিকাশের পাশপাশি অন্যান্য আনুষঙ্গিক, প্রাসঙ্গিক এবং অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ নিয়েও বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং তদানুযায়ী অর্ডারে তাঁর প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন। যেটি বর্তমান প্রেক্ষাপটে অর্থাৎ কোভিড-১৯ মহামারিকালীন অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে প্রতীয়মান হয়। পর্যটন খাতে সরকারের পাশাপাশি অন্যান্য যেকোন সংগঠনের অংশগ্রহণ এ খাতকে আরো সমৃদ্ধ করতে পারে, বঙ্গবন্ধু তাঁর দূরদর্শিতা দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন এবং 'বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন অর্ডার, ১৯৭২' এ সুস্পষ্টভাবে তার প্রতিফলন দেখা যায়। এক্ষেত্রে এ অর্ডারের ধারা ৫ এর (ঙ) বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য 'কর্পোরেশনের কার্যাবলীর সহিত সম্পৃক্ত করিবার উদ্দেশ্যে দেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে যেকোন সংগঠনকে উৎসাহ প্রদান করিবার অথবা সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, উক্তরূপ সংগঠনের সহযোগী হওয়া'। যেকোন খাতের উন্নয়নকে টেকসই করতে দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানবসম্পদের বিকল্প নেই। ১৯৭২ সনে প্রণীত অর্ডারে তার প্রতিফলন ঘটেছে। দক্ষ পর্যটন কর্মী গড়ার লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন-এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'ন্যাশনাল হোটেল এন্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইন্সটিটিউট'। এ খাতে পেশাদারি জনবল সৃষ্টি নিঃসন্দেহে এদেশের পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথকে প্রশস্ত করেছে এবং খুলে দিয়েছে এ খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির অবারিত দ্বার। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন (২০১৬) এর এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, এ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ইতোমধ্যে অসংখ্য মানুষ দেশে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ গ্রহণ করেছেন এবং উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-চেতনার ফসল এ প্রতিষ্ঠানটি পর্যটন শিল্প বিকাশে দক্ষ জনশক্তি গড়ার ক্ষেত্রে সৃষ্টিলগ্ন হতে অবদান রেখে চলেছে।

পর্যটন শিল্পের বিকাশ এবং দেশে বিদেশে পর্যটন শিল্পকে তুলে ধরার জন্য বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সালে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড আইনের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড' গঠন করেন। বোর্ড গঠনের পর বাংলাদেশের সৌন্দর্য্যমন্ডিত স্থানসমূহ যেমনঃ সুন্দরবন, কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, সেন্টমার্টিন দ্বীপ, পার্বত্য অঞ্চল, উপকূলীয় এবং হাওড় অঞ্চলে পর্যটন প্রচারের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি পর্যটককে আকৃষ্ট করে চলেছে। একটু সুযোগ পেলেই মানুষ প্রকৃতির টানে ছুটে যায় ঐসব স্থানে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে পর্যটন শিল্প বিকাশ, উন্নয়ন ও প্রচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

সূত্রঃ

১) Alam, S. M. (2016). Bangabandhu–The Great Philosopher, Nature Lover and Tourist Champion will glorify Tourism in Bangladesh as “Father of Tourism Industry”. *Journal of Tourism and Hospitality, 5*, 2-12

২) বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন (২০১৬), ”বাণিজ্যিক সাফ্যলের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন” http://www.parjatan.gov.bd/site/news [Accessed on December 22, 2020]

নদীর নাব্যতার নিঃশ্বাসে বাংলাদেশ

মাহবুব পারভেজ

বাংলাদেশের ভূখন্ড সৃষ্টি করেছে এদেশের ছোট বড় অসংখ্য নদী। নদ ও নদী পরিবেষ্টিত বাংলাদেশ প্রধানত একটি নিম্ন সমতলভূমির দেশ। মূলত চীন, ভুটান, ভারত এবং নেপালের নদ-নদী অববাহিকার পানির আধার ব-দ্বীপ বাংলাদেশ। প্রায় ৬ মিলিয়ন কিউসেক পানি আর বছরে আড়াই বিলিয়ন টন পলি বাংলাদেশের বুকের উপর দিয়ে প্রবাহিত ব্রক্ষপুত্র, পদ্মা, মেঘনা ও তাদের শাখা-প্রশাখা দিয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশে। ব্রক্ষপুত্র, পদ্মা ও মেঘনা এ তিনটি প্রধান নদী অববাহিকার মোট আয়তন প্রায় ১.৭২ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার যার মাত্র ৭ শতাংশ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত। (সূত্র: তথ্য চিত্র, বাংলাদেশ টেলিভিশন)

বাংলাদেশের নদ-নদীর সংখ্যা নিয়ে নানা মত রয়েছে। তবে পানি উন্নয়ন বোর্ড এর জরিপ অনুযায়ী দেশের মোট নদ-নদীর সংখ্যাা ৪০৫ টি। কারো কারো মতে শাখানদী কিংবা উপনদী মিলিয়ে বর্ষা মৌসুমে এর সংখ্যা দাঁড়ায় ৭১০টি তে; তবে তা ধারণা মাত্র। তবে সমগ্র বাংলাদেশে কোন না কোন স্থানে এই ছোট-বড় নদী গুলো একে অন্যের সাথে সংযুক্ত আর এটিই বাংলাদেশের তথা নদী-মাতৃক বাংলাদেশের সৌন্দর্য কিংবা শক্তি।

নদীর সাথে আমাদের পানীয় জলের যোগান, কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প ও সভ্যতার টিকে থাকা ও বিকশিত হবার সম্পর্ক নিবিড় বলেই আমাদের লোকালয়, শহর-বন্দর কিংবা নগরীগুলো একে একে নদ-নদীর পারে গড়ে উঠেছে। সেচের জল, পানীয় জল কিংবা শিল্প কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় জলের সরবরাহ নদীর মিঠা পানির সরবরাহের উপর নির্ভরশীল। শুধুমাত্র ঢাকা মহানগরীর পানীয় জলের সরবরাহ এখন প্রায় ৩০ শতাংশ নদীর জল থেকে মেটানো হয়। আগামীতে ঢাকায় তা ৭০ শতাংশ হবে নদীর জল পরিশোধন করে। (তথ্যচিত্র, বাংলাদেশ টেলিভিশন)

নদী কেন্দ্রিক সরাসরি জীবিকা জেলের এবং মাঝির। নৌযান পরিচালনার সঙ্গে যারা জড়িত তারাও। ভাসমান কৃষি কিংবা মৎস্য খামার নিয়েও অনেকে কাজ শুরু করেছেন। তবে এর বাইরেও কেউ কেউ নদী ব্যবহার করছে শিল্পকারখানার বর্জ্য অপসারণে, কেউ কেউ নদীর পার অবৈধভাবে দখল করে তৈরি করছেন শিল্প কারখানা কিংবা আবাসস্থল, কিংবা নিয়মিত ফেলছেন দৈনন্দিন বর্জ্য। নদীর সঠিক ব্যবহার একটি শৈল্পিক ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থায় জলের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা এবং একই সঙ্গে নদীর জলে মাছ ও জলজপ্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন যাপনের পরিবেশ নিশ্চিত করা দরকার। নদীর পথ ও তার সম্পদ রাষ্ট্রের সম্পত্তি; সমষ্টির কল্যাণে তার ব্যবহার নিশ্চিত করা দরকার।

আমাদের চিন্তায়, অস্তিত্বে এবং ভালবাসায় নদী ওতপ্রোতভাবে জড়িত; জড়িত প্রায় সব ধরনের প্রাথমিক অর্থনীতির সাথে। খৃস্টের জন্মেরও প্রায় পাঁচশ বছর আগে এ অঞ্চলে প্রাচীন সভ্যতার পুন্ড্র নগরী গড়ে উঠেছিল করতোয়া নদীর তীরে। ১২০৪ সনে ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খলজি বাংলায় অভিযানে এসে গঙ্গার চেয়ে ৩ গুণ বড় প্রশস্ত করোতোয়া নদী দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। সাহিত্য ও সাহিত্য চিন্তায় নদী ও নারী প্রায় সমান্তরালভাবে গান কবিতা, দর্শন এবং চলচিত্রে স্থান করে নিয়েছে। নদী জড়িয়ে ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সারা জীবনের সাথে। তাঁর জন্মস্থান গোপালগঞ্জ জেলা মূলত নদী কেন্দ্রিক। তাঁর বাড়ির আশেপাশে যাতায়াতের মাধ্যম ছিল নৌকা। তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে ৪০-৫০ দশকের নৌপথের জীবন্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন- ‘পরের দিন নৌকায় আমরা রওনা করলাম, আশুগঞ্জ স্টেশনে ট্রেন ধরতে। পথে পথে গান চলল। নদীতে বসে আব্বাস উদ্দিন সাহেবের ভাটিয়ালি গান তার নিজের গলায় না শুনলে জীবনের একটি দিক অপূর্ণ থেকে যেতো। তিনি যখন আস্তে আস্তে গাইতে ছিলেন তখন মনে হচ্ছিল, নদীর ঢেউ গুলিও যেন তাঁর গান শুনছে।

নদীর প্রতি তাঁর নিছক ব্যক্তিগত মুগ্ধতা নয়; নদী ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও তিনি ভেবেছেন পঞ্চাশের দশক থেকে।

লেখক: মাহবুব পারভেজ, সহযোগী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান, ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু স্পষ্টতই নিজের সময়ের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন। ১৯৫৬ সালে আওয়ামীলীগ কাউন্সিলে তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন- 'বন্যা পূর্ব পাকিস্তানিদের জীবনে নূতন নয়। কিন্তু বিজ্ঞান সমৃদ্ধ ও সম্পদ বলিষ্ঠ মানুষ অসহায়ের মত আজও প্রকৃতির রুদ্র পীড়ন সহ্য করিবেন কিনা ইহা হইল সবচেয়ে বড় সওয়াল। হোয়াংহো নদীর প্লাবন, ট্যানিসিভ্যালির তান্ডব ও দানিয়ুবের দুর্দমতাকে বশে আনিয়া যদি মানুষ জীবনের সুখ সমৃদ্ধির পথ রচনা করিতে পারে তবে পদ্মা, মেঘনা ও যমুনার মত শান্ত নদীকে আয়ত্ত করিয়া আমরা কেন বন্যার অভিশাপ হইতে মুক্ত হইব না?' (দৈনিক আজাদ, ২০ মে ১৯৫৬)

১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু নদী খননে উদ্যোগী হয়েছিলেন। রাজবাড়ীর পাংশায় চন্দনা-বারাসিয়ান নদী খননের মধ্যে দিয়ে এই কাজের উদ্বোধন করেছিলেন। তিনি তখনই রাষ্ট্রের সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও কিনেছিলেন ড্রেজার। আঞ্চলিক অভিন্ন নদী দেশের অভ্যন্তরীণ নদী ব্যব্যস্থায় কতটা প্রয়োজন এখন আমরা সংকট থেকে শিখছি। অথচ বঙ্গবন্ধু তখনই বুঝেছিলেন আমাদের অভিন্ন প্রায় সব নদীর উজান যেহেতু ভারতে, সেখান থেকে পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে সর্বাগ্রে।

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে তখন নদী ভাঙ্গন ছাড়া অন্যান্য সংকটগুলো প্রকট হয়নি, কিন্তু বঙ্গবন্ধু বালু উত্তোলন ছাড়া বাকি সংকটগুলো নিয়ে তখনই সুদূর প্রসারী চিন্তা ভাবনা করেছেন এবং সামর্থ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। নদী বান্ধব এই মানুষটিকে নিয়ে নদীর স্বাধীন সত্তার সঙ্গে মিলিয়ে, নদীর নাব্যতাকে ধারণ করে অন্নদাশঙ্কর রায় তাই লিখে গেছেন-

যত কাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান
তত কাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।

সহজ স্বাভাবিক অর্থে নদীর ব্যবহার আমাদের বাড়াতে হবে সঠিক ব্যবস্থাপনায়; সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। পাশ্চাত্য রীতি নীতিতে আমরা উড়াল সেতু কিংবা মেট্রো রেলের কথা চিন্তা করছি। চিন্তা করছি আকাশ পথের কথা।ব্রীজ কালভার্ট কিংবা মহা সেতু আমাদের চোখে ভাসে। অথচ আমাদের মূল শক্তি অভিন্ন নদী সত্তার কথা আমরা চিন্তা করছিনা। আমাদের এই বিপুল জনশক্তি পরিবহনে এবং তা সমগ্র দেশে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে একই বিভাগসহ জেলাসমূহে নদী দ্বারা আমরা সংযুক্ত হতে পারি। মানুষ যে পথে চলবে প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী সে পথে তৈরি হবে জীবিকা নির্বাহের অন্যান্য উপকরণ।প্রয়োজনেই নদী দখলের পরিবর্তে নতুন করে তৈরি করতে হবে নদীপথ, বন্দর, নগর।

নদী তার নাব্যতা হারালে বাংলাদেশ হারাবে তার নিঃশ্বাস। প্রাথমিকভাবে কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে ক্ষেতের ফসল নদীর মাছ নির্ভর জীবন ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধ না থেকে সেবাভিত্তিক অর্থনীতিতেও প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ। শুধু খাদ্য আহরণের ভেতর সীমাবদ্ধ না রেখে নদীকে শিল্প ও পর্যটন খাতেও জড়িত করা সম্ভব। কলকাতার সাথে পরীক্ষামূলক নৌবুটে চলাচল কিংবা চাঁদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী ও ভোলার সাথে ঢাকার বিলাসবহুল সার্ভিসকে আরো সম্প্রসারিত করা এখন সময়ের দাবি।

সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে দেশের দখল হওয়া নদ-নদী উদ্ধার, নদীর পরিবেশ রক্ষা এবং প্রবাহ হারানো নদীগুলো খনন, নাব্যতা ফেরানোর বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। ২০১৯ সালে বিশ্ব পানি দিবসের বক্তৃতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অঙ্গীকার করেছেন যে দেশজুড়ে ১০ হাজার কিলোমিটার পানি পথ পুনরুদ্ধারে তার সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। নদীতে একটি 'জীবনসত্ত্বা' তার বোধ মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং নদীর পরিবেশ রক্ষায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা চলছে। এখন শুধু নতুন করে ভাবতে হবে নদী পথের সঠিক ব্যবহার। সমগ্র বাংলাদেশ যে নদী দ্বারা যুক্ত এবং সম্পর্কিত তার সঠিক ব্যবহার শুরু করতে পারলেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পৃথিবীর বুকে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে বাংলাদেশ।